Registration No.: S/L/97407 of 2012-13
বিজ্ঞান মনস্ক'র মুখপত্র

সমীক্ষণ

দ্বাদশ বর্ষ❖সংখ্যা ১❖মার্চ ২০২২

মহাবিশ্বের জন্ম রহস্য সন্ধানে জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ

- জিনের মহাফেজখানা
- হিজাব বিতর্ক এবং তার উৎস সন্ধান

:সূচিপত্র:

◈ সম্পাদকীয় ঃ ২

◈ বিজ্ঞানের বিশেষ খবর ঃ ৪
◆ মহাবিশ্বের জন্ম রহস্য সন্ধানে জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ

◈ সমাজ দর্পণ ঃ ৭
◆ হিজাব বিতর্ক এবং তার উৎস সন্ধান
◆ নৃশংস ধর্মীয় প্রথা 'চুরাল মুরিয়াল' চলছে

◈ বিশেষ নিবন্ধ ঃ ১৩
◆ জিনের মহাফেজখানা

◈ বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী ঃ ১৬
◆ মহান বিজ্ঞানী গ্যালিলিও গ্যালিলি

◈ ধারাবাহিক নিবন্ধ ঃ ১৯
◆ মহাবিশ্বের অন্বেষণে মানুষ

◈ চয়ন ঃ ২৩
◆ অপবিজ্ঞান – রাজশেখর বসু

◈ বিজ্ঞানের খবর ২৬

◈ অতিথি কলম ঃ ২৯
◆ 'সহি জাতীয়তাবাদী চিকিৎসাবিজ্ঞান' ও আমরা

◈ কুসংস্কার টিকিয়ে রাখে কারা ঃ ৩১
◆ UGC-র 'বৈজ্ঞানিক' উপদেশ

◈ সংগঠন সংবাদ ৩২

সম্পাদকীয় ঃ

বিজ্ঞান সর্বত্র পূজ্যতে!

স্বাধীনতার ৭৫ বছর উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ভারত সরকার পালন করছে 'আজাদী কা অমৃত মহোৎসব'। তার অংশরূপে দেশজুড়ে ২২-২৮শে ফেব্রুয়ারী 'বিজ্ঞান সর্বত্র পূজ্যতে' নামক বিজ্ঞান মহোৎসবের আয়োজন করা হল কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রক, ভূবিজ্ঞান মন্ত্রক, জৈব প্রযুক্তি মন্ত্রক, পরমাণু শক্তি মন্ত্রক ইত্যাদি এবং বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সংস্থা সমূহের উদ্যোগে। ২৮শে ফেব্রুয়ারীকে ভারত সরকার জাতীয় বিজ্ঞান দিবস রূপে নির্দিষ্ট করেছে বিশিষ্ট পদার্থ বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমণ দ্বারা 'রমণ এফেক্ট' আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির (১৯৩০) স্মরণে। ঐ দিন সমাপ্ত হওয়া 'বিজ্ঞান সর্বত্র পূজ্যতে' উৎসব এক সপ্তাহ ধরে ৭৫ স্থানে ৭৫ ধরনের বক্তৃতামালা, ৭৫ রকমের ফিল্ম, ৭৫ প্রকারের রেডিয়ো আলোচনা সহযোগে মহাসমারোহে পালিত হয়েছে। উচ্চ শিক্ষার নিয়ামক সংস্থা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি) কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় সহ সকল উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এই মহোৎসব পালনের নির্দেশিকা জারী করে। আলোচনা ও অন্যান্য কার্যক্রমে মুখ্যবিষয় সমূহ ছিল – স্বদেশী পরম্পরাগত আবিষ্কার ও উদ্ভাবন, ভারতের বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্য, আধুনিক ভারতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মাইলফলক সমূহ ইত্যাদি।

হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী সমুদ্র মন্থন করে তোলা অমৃতের ভাঁড় দেবতারা হস্তগত করে অমরত্ব লাভ করেছিলেন। সমুদ্র মন্থন করা কঠিন শ্রমসাধ্য কাজ। স্বভাবতই দেবতারা অপরের শ্রমের ফসল হস্তগত করেছিলেন! ১৯৪৭ এর পর স্বাধীনতার 'অমৃত' ভারতবাসীর কারা ভোগ করছেন সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। বর্তমানে ভারত হল সেই দেশ যেখানে সবচেয়ে দ্রুতগতিতে শত কোটিপতির (বিলিয়নেয়ার) সংখ্যা বেড়ে চলেছে। শ্রমজীবী জনগণ-তরুণ যুব সমাজ-বুদ্ধিজীবী-বিজ্ঞানীকুলের শ্রম ও মেধারূপী অমৃত ভক্ষণ করে চলেছেন জনসংখ্যার এক শতাংশ। রাজনৈতিক পরিভাষায় যাদের বলা হয় পুঁজিপতি। তাঁরা নিজেরা অবশ্য এই শব্দ পছন্দ করেন না। তাঁরা পছন্দ করেন 'শিল্পপতি'-'উদ্যোগপতি' ইত্যাদি শব্দাবলী। ভারতের সংসদে দাঁড়িয়ে একজন জনপ্রতিনিধি নির্দিষ্টভাবে এই পুঁজিপতিদের মধ্যকার শিরোমণিদের পূজো করার নিদান দিয়েছেন।

ভারত সরকারের 'বিজ্ঞান সর্বত্র পূজ্যতে' উৎসবকে এই প্রেক্ষাপটেই দেখা বিজ্ঞানসম্মত। দেশে সাধারণভাবে শিক্ষা খাতে বিশেষভাবে বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণা খাতে সরকারের বরাদ্দ

তলানিতে এসে ঠেকেছে। স্বভাবতই উচ্চ শিক্ষা ও বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রগুলো ধুঁকছে। গবেষকরা সরকারী স্কলারশীপের ব্যর্থ আশায় কাল কাটাচ্ছেন। বিপুল সংখ্যক শিক্ষক-অধ্যাপকদের পদ খালি রেখে নামমাত্র বেতন-দক্ষিণার বিনিময়ে আংশিক-ঠিকা-চুক্তিভিত্তিক-অতিথি ইত্যাদি রকমারী নামের শিক্ষক-অধ্যাপক দিয়ে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় চালানো হচ্ছে। যোগ্যতাসম্পন্ন (এমনকি যোগ্যতা নির্ধারক পরীক্ষায় কৃতকার্য শিক্ষক পদপ্রার্থীরা) ক্লাসরুমের বদলে মহাপুরুষদের মূর্তির পায়ে অথবা দপ্তরের দরজায় দিনের পর দিন ধর্না-অনশন চালাচ্ছেন এবং প্রায়ই আইনরক্ষকদের ঠেঙানি খাচ্ছেন। প্রায় প্রত্যেক রাজ্যে এটাই বাস্তব চিত্র।

চিত্রের উল্টো পিঠটা হল পূজনীয় পুঁজিপতিদের নিজস্ব বিশ্ববিদ্যালয়-উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার অবাধ লাইসেন্স দিয়ে শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে আরো শ্রীবৃদ্ধি ঘটানোর সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। যেখানে অমৃতরূপী পুঁজির থলি ছাড়া প্রবেশাধিকার পাওয়া প্রায় অসম্ভব।

'বিজ্ঞান সর্বত্র পূজ্যতে' উৎসব পালনে বর্তমান সরকারের আরো এক নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে যা আলোচনা ও কার্যক্রমের বিষয়বস্তু থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়। সেটা হল 'স্বদেশী পরম্পরাগত আবিষ্কার ও উদ্ভাবন' এবং 'ভারতের বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্য' চর্চার নামে বিশেষ এক মতবাদ প্রচার করা। এই মতবাদ দ্বারা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয় আধুনিক বিজ্ঞানের যা কিছু আবিষ্কার ও উদ্ভাবন সবই ঐ দেবতাদের পূণ্যভূমি প্রাচীন ভারতে হয়েছিল, যে সময়ে কোন বিধর্মীর এই মাটিতে পদক্ষেপণ হয়নি। গণেশ ঠাকুরের প্লাস্টিক সার্জারীর দ্বারা মুন্ডস্থাপন থেকে মুম্বইয়ের জুহুচৌপট্টি সমুদ্রতট থেকে প্রথম বিমান উড়ান (এই বিমানের নক্সা প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থে পাওয়া গিয়েছিল!)। তালিকার শেষ নেই। বিদ্বজ্জন-বিজ্ঞানীদের মধ্যেকার উল্লেখযোগ্য একাংশ এই সামগ্রিক পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার দায়িত্ব নিয়েছেন। তাঁদের হাতে প্রায় প্রত্যেক শিক্ষা ও গবেষণা সংস্থার পরিচালনার দায়ভার তুলে দেওয়া হচ্ছে। আবার এঁদেরই কেউ বিজ্ঞানীর রূপ ধারণ করে বিজ্ঞান কংগ্রেসে 'গবেষণা' পেশ করে বলছেন – 'আগামী দিনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর নামে অভিকর্ষ তরঙ্গের নামকরণ করা হবে' অথবা 'আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব সম্পূর্ণই ভুল এবং তিনি সঠিক আপেক্ষিক তত্ত্ব নির্মাণ করেছেন।' বিজ্ঞান কংগ্রেসের গবেষণা পত্র থেকে এই 'ভারতীয় জ্ঞান ব্যবস্থা' নামক পরিকল্পনা ক্রমশ নিশ্চিত গতিতে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে চলেছে।

ঐতিহাসিক বিজ্ঞান এই পরিকল্পনার বিশেষ টার্গেট বা লক্ষ্যবস্তু। জার্মানীর নাৎসীবাদ দ্বারা তত্ত্ব ও কর্মে দীক্ষিত এই গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত করতে চায় যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূত্রপাত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শুরু হয়নি। শুরু হয়েছিল তারও অন্তত আটশো বছর আগে। এর দ্বারা এক ঢিলে দু পাখি মারা যায়। প্রথমতঃ ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের বিদেশী রূপে বা দখলদার রূপে চিহ্নিত করা। দ্বিতীয়তঃ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঐ গোষ্ঠী এই যুক্তিতে অংশগ্রহণ করেনি যে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে শক্তিক্ষয় অনাবশ্যক। শক্তি সংরক্ষিত রাখতে হবে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের পদদলিত করে হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য। স্বাধীনতা কামী ভারতের ব্যাপক জনগণ এদের ঘৃণা করে। ইতিহাসের 'পুনর্নির্মাণ' দ্বারা স্বাধীনতা সংগ্রামকে পিছিয়ে দিতে পারলে হিন্দুরাজা ও সেনাপতিদের উত্তরাধিকারী রূপে তারাও স্বাধীনতা সংগ্রামের অংশভাগী হতে পারবে। ইতিমধ্যেই রেল গাড়ির কামরার নাম থেকে রেল স্টেশনের নামে এই কূলের গুরুদের প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। জেলা-শহর-জনপদের নাম পরিবর্তন করা হচ্ছে।

সাম্প্রতিক কালে কোভিড অতিমারির মোকাবিলায় তালি বাজানো-থালি বাজানো-ঘর অন্ধকার করে প্রদীপ জ্বালানো-করোনা দেবীর পূজা কিছুই বাদ পড়েনি সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা থেকে। এরোপ্লেন থেকে চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য ফুলের পাপড়ি ছোড়া হয়েছিল আর মানুষের মৃতদেহ জলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর মৃতদেহের স্তুপে বসে ঘোষণা করা হয়েছিল ভারত থেকে করোনা চলে যাবার মুখে। পূজনীয় পুঁজিপতিদের জন্য প্যাকেজ ঘোষিত হয়েছিল আর কয়েক কোটি নিম্ন আয়ের শ্রমজীবীদের যানবাহন বন্ধ করে রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। ভ্যাকসিন প্রস্তুতি আর রপ্তানীতে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করা হয়েছিল আর ভারত সরকারের আয়ূষ মন্ত্রক দ্বারা অপরীক্ষিত আয়ুর্বেদ-ইউনানি-হোমিওপ্যাথী ওষুধের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে।

সদর্থে বিজ্ঞান পুজোর অর্থ যদি হয় সতত প্রগতিশীল বৈজ্ঞানিক বিকাশ ও উদ্ভাবন সম্পর্কে ছাত্র-যুব তথা জনগণকে শিক্ষিত করে তোলা এবং বিজ্ঞান মনস্কতা গড়ে তোলা, তাহলে সরকারী মহোৎসবের উদ্দেশ্য তার বিপরীত। পশ্চাদপদ-বিদ্বেষমূলক সংস্কৃতির ভজনা আর পুঁজির পূজার্চনা দ্বারা বৈজ্ঞানিক বিকাশকে মুনাফার স্বার্থে ও সাধারণ জনগণকে দমনের স্বার্থে ব্যবহার করাই এর উদ্দেশ্য।

বিজ্ঞান পুজো করার বিষয় নয়। অনুশীলন করার বিষয়। জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে, তথাকথিত বিজ্ঞান প্রেমী বা বিজ্ঞান বিরোধী সকলেই প্রতি মুহূর্তে বিজ্ঞানকেই অনুশীলন করে। মানুষের দ্বারা মানুষকে শোষণ করার, শ্রেণীতে-শ্রেণীতে বিভাজিত এই সমাজে বিজ্ঞানের অমৃতময় সুফল সমগ্র মানব সমাজের স্বার্থে সকলের মধ্যে প্রসারিত করার দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে প্রগতিশীল জনতাকে – ছাত্র-যুব সমাজ, বিজ্ঞানকর্মীদের।■

বিজ্ঞানের বিশেষ খবর ঃ

মহাবিশ্বের জন্ম রহস্য সন্ধানে জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ

– সঞ্জয় পাল

সভ্যতার ইতিহাসে বিজ্ঞান মানব সভ্যতাকে উপহার দিয়েছে বেশ কিছু জটিল যন্ত্র। তাদের মধ্যে অন্যতম জেমস ওয়েব দূরবীন। গঠনগত জটিলতা এবং কক্ষপথে স্থাপন এই দুই বিষয় জেমস ওয়েবকে আলাদা করেছে অন্যান্য বিজ্ঞানের ঘটনা থেকে। জেমস'কে মহাকাশে পাঠানো ও কক্ষপথে স্থাপন ছিলো নাসার বিজ্ঞানীদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। বিজ্ঞান আর প্রকৌশল বিদ্যার অপূর্ব মেলনবন্ধন জেমস। বিজ্ঞানের প্রকৌশল আশ্চর্য LHC বা LIGO-র সাথে একই আসনে বসানো যায় জেমসকে। LHC সফলভাবে খুঁজে পেয়েছে স্ট্যান্ডার্ড মডেলের হারানো কণা হিগস বোসন আর LIGO প্রমান করেছে মহাকর্ষ তরঙ্গের অস্তিত্ব। জেমস সফল ভাবে কাজ শুরু করলে তা হবে তৃতীয় আর এক আশ্চর্য।

১৯৬১ থেকে ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নাসার পরিচালক ছিলেন জেমস ওয়েব। তার সয়কালে চন্দ্রাভিমুখী অ্যাপোলো প্রোগ্রাম সফল হয়। যা মানব সভ্যতার ইতিহাসে একটা মাইল ফলক। আর মহাকাশের এই সাফল্যকে চিরস্মরণীয় করতে নাসা ঠিক করে জেমস ওয়েবের নামেই পরবর্তী মেগা প্রজেক্টটির নাম। প্রাথমিকভাবে ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে হাবল পরবর্তী একটি দূরবীন এর কথা ভাবা হয়। বাজেট ঠিক হয় ৫০০ মিলিয়ন ডলার। পরবর্তী ২৫ বছরে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১০ বিলিয়ন ডলার। আর এই বিপুল ফান্ডিং জোগাড় করতে নাসার রাতের ঘুম ছুটে গিয়েছিল। বেশ কিছু প্রজেক্ট সাময়িক ভাবে বন্ধ করতেও হয়েছিল। সমালোচনাও হয়েছিল অনেক। তবু বিজ্ঞানীরা জানতেন জেমস এর সফলতা ঢেকে দেবে সমস্ত সমালোচনা।

আসলে হাবল টেলিস্কোপই প্রথম মানুষকে শিখিয়েছিলো ডিপ স্কাই অবজেক্ট এর ছবি তুলতে। দূরবর্তী গ্যালাক্সিগুলির এতো স্পষ্ট ছবি মানুষ আগে দেখেনি। আর সেই পাওয়া থেকেই বিজ্ঞানীদের মনে জন্ম নেয় নতুন চাওয়া। আরো দূরবর্তী গ্যালাক্সির আরও ভালো স্পষ্ট ছবি চাই। আর তখনই পরিকল্পনা শুরু হয় জেমসকে নিয়ে, যে পারবে হাবল এর থেকেও অনেক দূরের আলোকে লেন্স বন্দি করতে। ভাবনাটা সহজ হলেও কাজটা ছিলো কঠিন।

আসলে হাবল এর থেকেও আরো দূরবর্তী গ্যালাক্সির ছবি তুলতে জেমসকে টাইম ট্রাভেল করতে হবে। এই টাইম ট্রাভেলের বিষয় পাঠকের বোঝার সুবিধার্থে দু'কথা বলা দরকার। আমাদের পার্থিব জগতের সদা পরিবর্তনশীল সকল বস্তুর যে মুহূর্তের ছবি আমরা প্রত্যক্ষ করি, তার অতি নগণ্য সময়কাল আগে ঐ বস্তুটি চিত্রে বর্ণিত অবস্থা থেকে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। উভয়ের মধ্যকার পার্থক্য এতটাই কম যে বলা যায় প্রায় যে মুহূর্তে ঘটনাটি ঘটল, এই প্রাপ্ত ছবিও সেই মুহূর্তেরই। এর কারণ বস্তুটির থেকে আমাদের ক্যামেরা (আমাদের চোখও ক্যামেরা)-র স্বল্প দুরত্ব এবং আলোর বিশাল দ্রুতি (Speed) ৩ লক্ষ কিমি প্রতি সেকেন্ড। কিন্তু বস্তুটি যদি বহুদূরে অবস্থিত হয়, তবে আলোক রশ্মির দ্রুতি বেশি থাকা সত্বেও আমাদের গোচরে আসা ছবি হবে অতীতের বস্তু। সেরকম দূরের বস্তুর ছবি টেলিস্কোপ ধরলে তা হবে টাইম ট্রাভেল। জেমস'কে তুলতে হবে সৃষ্টির আদি মুহূর্তের ছবি। মনে রাখতে হবে জেমস যে দূরত্বের ছবি তুলতে চাইছে সেই সময় গ্যালাক্সিগুলো সবে গঠন হতে শুরু করেছে। বিগ ব্যাং এর পরবর্তী কয়েক লক্ষ বছর মহাকাশের মারাত্মক ঘনত্বের ফলে ফোটন কণা গুলো ক্রমাগত মুক্ত ইলেক্ট্রন কণার সঙ্গে আঘাতের ফলে প্রোটনের ভিড় থেকে বেরিয়ে আসতে পারছিল না। প্রায় চার লক্ষ বছরের অজ্ঞাতবাস শেষ করে মহাকাশ যখন প্রসারিত হতে শুরু করলো তখন ঘনত্ব কমে গিয়ে ইলেক্ট্রনগুলো প্রোটনের সাথে জোট বেঁধে তৈরী করলো প্রথম হাইড্রোজেন পরমাণু। উষ্ণতা কমে দাঁড়ালো ৩০০০ কেলভিন। আধানহীন হাইড্রোজেন পরমাণু ফোটন কণার সাথে কম মিথস্ক্রিয়া করে। ফলস্বরূপ ফোটন ছড়িয়ে পড়লো মহাবিশ্বে। আর সেই ফোটনগুলি আমরা দেখি কসমিক মাইক্রোওয়েব ব্যাকগ্রাউন্ড (CMB) হিসাবে। আমরা মহাকাশের যেদিকেই আমাদের চোখ রাখি CMB রেডিয়েশনই চোখে পড়ে। এর পর ধীরে ধীরে মহাবিশ্ব আরো শীতল হতে শুরু করলো। জমাট বাঁধতে শুরু করলো মহাজাগতিক মেঘগুলো। বিপুল মেঘ কাছে আসতে আসতে আবদ্ধ হতে থাকল মহাকর্ষীয় বলের প্রভাবে। মারাত্মক মহাকর্ষীয় বল আর পরমাণুর নিউক্লিয়াস মধ্যস্থ শক্তিশালী নিউক্লিয় বল জন্ম দিল প্রথম তারার। তখন এরা মূলত অতিবেগুনি আলোয় উদ্ভাসিত ছিলো। সেই বর্ণালী নিঃতড়িৎ হাউড্রোজেন পরমাণু খুব সহজেই শোষণ করে নিতে পারতো। ফলে প্রথম তারার জন্ম আমাদের কাছে অদৃশ্য থাকার কথা। মহাকাশবিদরা এই সময়টার নাম দিয়েছেন অন্ধকার যুগ। এরপর হাইড্রোজেন পরমাণুগুলি এই আলো শোষণ করে খুব সহজেই আয়নিত হয়ে যেতে শুরু করে। আয়নিত হাইড্রোজেন ফোটন কণা শোষণ করতে পারে না। ফলস্বরূপ ৩০০ মিলিয়ন বছর পর এই তারার বা তাদের দ্বারা গঠিত গ্যালাক্সিগুলো দৃশ্যমান হতে শুরু করে। মহাবিশ্বের প্রথম আলোর সবটা যে নিঃতড়িৎ হাইড্রোজেন শোষণ করতে পারবে

তেমন নয়। কিছু উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন রেডিয়েশন অবশ্যই থাকবে। তাই জেমস ওয়েবের দ্বারা তাদেরকে সনাক্ত করার সম্ভাবনাও আছে। হয়ত অদূর ভবিষ্যতে অন্ধকার যুগের তারার ছবিও পেতে পারি জেমসের কাছ থেকে।

হাবল সবচেয়ে দূরবর্তী যে গ্যালাক্সির ছবি তুলেছে তার নাম GN-z11। এটির লাল সরণ [বর্ণালিতে অতিবেগুনি আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সব থেকে কম, আর লাল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সর্বাধিক। লাল সরণ (red shift) হল আলোক তরঙ্গের কম তরঙ্গদৈর্ঘ্য থেকে বেশি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের দিকে পরিবর্তন। এই তরঙ্গদৈর্ঘ্যর পরিবর্তনের কারণ মহাবিশ্বের ক্রমপ্রসারণ।] ১১-র কাছাকাছি। অর্থাৎ কার্বন পরমাণু থেকে নির্গত ০.১৯ মাইক্রোমিটারের অতিবেগুনী বর্ণালী রেখা আমরা শনাক্ত করছি ২.২৮ মাইক্রোমিটার (০.১৯ মাইক্রোমিটারের প্রায় ১১ গুণ তরঙ্গদৈর্ঘ্য হল ২.২৮ মাইক্রোমিটার) অবলোহিত বা ইনফ্রারেড তরঙ্গে। আধুনিক সময়ের মহাজাগতিক মডেল অনুযায়ী গ্যালাক্সিটির আলো বিগ ব্যাং এর ৪০০ মিলিয়ন বছর পরে নির্গত হয়ে ১৩.৩ বিলিয়ন বছর চলার পর আমাদের চোখে পৌঁছেছে। অর্থাৎ বলা যায় যে যত দূরের নক্ষত্র, তার লাল সরণ তত বেশি এবং অতিবেগুনি তরঙ্গ অবলোহিত তরঙ্গ হিসাবে দেখা যাবে। সুতরাং দূরবীনকে অবলোহিত তরঙ্গ সংবেদী হতেই হবে। হাবল ক্যামেরা সেন্সর ০.৮ থেকে ২.৪ মাইক্রোমিটার রেঞ্জে কাজ করে। জেমস এর ক্যামেরা সেন্সর কাজ করবে ০.৬ থেকে ২৮.৫ মাইক্রোমিটার রেঞ্জে। যা দূরবর্তী গ্যালাক্সি খুঁজতে সাহায্য করবে।

কোনো নক্ষত্র মণ্ডলের আলো ১৩.৩ বিলিয়ন বছর আগে রওনা দিয়েছে মানে এটা নয় যে ওই নক্ষত্রটির দূরত্ব ১৩.৩ বিলিয়ন আলোকবর্ষ। কারণ ওই আলো বিকিরণের সময় নক্ষত্র মন্ডলটি অনেক কাছে ছিল। এই মুহূর্তে নক্ষত্র মন্ডলটির দূরত্ব অনেক বেশি হবে। স্থানের প্রসারণের কারণে নক্ষত্র মন্ডলগুলির দূরত্ব বের করা বেশ জটিল। সমতল মহাবিশ্বে GN-z11 এর বর্তমান দূরত্ব প্রায় ৩২ বিলিয়ন আলোকবর্ষ। অর্থাৎ নক্ষত্র মন্ডলটি আলোর থেকে বেশি বেগে দূরে সরে যাচ্ছে। ফলস্বরূপ সেখান থেকে এই মুহূর্তে যে আলো নির্গত হচ্ছে তা আমরা কোনো দিনই দেখতে পাব না।

এবার দেখা যাক জেমস ওয়েব এর ম্যাগনিফিকেশন কী রকম। এই ম্যাগনিফিকেশনের জন্য দরকার হাবল টেলিস্কোপ থেকে বেশি পরিমাণ অবলোহিত রশ্মিকে জেমসের লেন্স পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া। যত বড় আয়না, তত কার্যসিদ্ধি হবে বেশি। ওয়েবের প্রাথমিক আয়নার ব্যাস ৬.৫ মিটার। সেই তুলনায় হাবল এর আয়নার ব্যাস ছিল ২.৪ মিটার। ক্ষেত্রফল হিসাব করলে জেমস, হাবলের থেকে ৭ গুণ বড় আয়না নিয়ে গেছে। বলা হচ্ছে চাঁদে থাকা একটি মৌমাছির তাপ ও জেমস সনাক্ত করতে পারবে। এই ধরনের সঠিকতা আনার জন্য নাসা বেশ কিছু প্রকৌশল এর সাহায্য নিয়েছে।

যেহেতু জেমস অবলোহিত তরঙ্গ সনাক্ত করবে তাই তাপমাত্রা একটা বড় ফ্যাক্টর। দূরবীনের বিভিন্ন ডিটেক্টরও অবলোহিত তরঙ্গ বিকিরণ করবে। তাই তাপমাত্রা রাখতে হবে খুব কম। প্রায় ৫০ কেলভিন। জেমস ওয়েব যাতে তার লক্ষ্য বস্তুর থেকে আগত অবলোহিত রশ্মিতে সংবেদনশীল হয়, তার জন্য অন্য কোনো উৎস থেকে আগত রশ্মি থেকে তাকে মুক্ত রাখার প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সব থেকে বড় বাধা সূর্য। তাই দূরবীনটিকে পৃথিবী থেকে দূরে এমন অবস্থানে রাখা দরকার যেখানে সর্বদা পৃথিবী সূর্যকে তার থেকে আড়ালে রাখবে। এর জন্য ঘূর্ণনরত অবস্থায় পৃথিবী থেকে জেমসের আপেক্ষিক দূরত্ব সর্বদা এক থাকার প্রয়োজন। আর সেই কারণে জেমসকে নাসা L2 লাগ্রাঞ্জ বিন্দুতে স্থাপন করবে। একটি

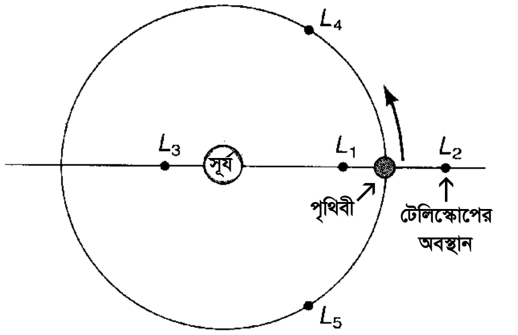

সিস্টেমে যদি দুটি বড় বস্তু মাধ্যকর্ষণের মাধ্যমে একে অপরের সাথে মিথস্ক্রিয়া করে, তবে সেখানে পাঁচটি বিন্দু পাওয়া যাবে যেখানে তৃতীয় কোনো বস্তু রাখলে অপর দুটির তুলনায় সেটি একই স্থানে স্থিত থাকবে। এটি লাগ্রাঞ্জ ১৮ শতকে গাণিতিক উপায়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। জেমস থাকবে L2 থেকে কিছুটা দূরে। বিন্দুটি পৃথিবীর পিছনে সূর্য থেকে দূরের একটি বিন্দু। জেমসকে এমন ভাবে রাখা হবে তাতে মনে হবে জেমস L2 প্রদক্ষিণ করছে কিন্তু কার্যত দূরবীনটি সূর্যকেই প্রদক্ষিণ করছে। L2 বিন্দুতে দূরবীনের অবস্থানের জন্য তার একদিকে পৃথিবী ও সূর্য আর অন্যদিকে ফাঁকা ও অন্ধকার। তাই সূর্যের দিকে ১৪×২১ বর্গমিটার একটি ঢাল ব্যবহার করা হবে তাপ আটকানোর জন্য। এই ঢালটি এমন একটি রাসায়নিক দিয়ে তৈরী যা সহজেই তাপ শোষন ও বিকিরণ করতে পারবে। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো জেমস ওয়েবের ফোকাসে MIRI (Mid-infrared instrument) নামের একটি ডিটেক্টর আছে। এটি ৫ থেকে ২৮ মাইক্রো মিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যে কাজ করে। এই ডিটেক্টরটি ঠিক মত কাজ করতে ৫০ কেলভিন নয় মাত্র ৭ কেলভিন তাপমাত্রা হতে হবে। তরল হিলিয়াম ব্যবহার করে এই তাপমাত্রা অর্জন করা হবে। খুব পাতলা এই ঢালটি ১২ বার ভাঁজ করে রকেটে ঢোকানো হয়েছে। কক্ষপথে প্রতিস্থাপনের পর এটি তার সঠিক স্থানে ইনস্টল করা হবে।

এবার আসি দূরবীনের মূল আয়নায়। জেমস তৈরিতে কাঁচের আয়না ব্যবহার করা হয় নি। আয়না তৈরী করতে ব্যবহার করা হয়েছে হালকা বেরিলিয়ামের চাদর। আর তার উপর দেওয়া আছে সোনার আস্তরণ। সোনা ভীষণ দক্ষতার সঙ্গে অবলোহিত তরঙ্গ প্রতিফলিত করে। ১৮টি ষড়ভুজ আকৃতির ছোট টুকরো একসাথে জুড়ে তৈরী হবে ৬.৫ মিটারের পূর্ণাঙ্গ আয়না। ১৮টি টুকরো জুড়ে পূর্ণাঙ্গ আয়না তৈরী করা বিজ্ঞানীদের কাছে অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। আর এই সাফল্যের উপর দাড়িয়ে আছে জেমস ওয়েব এর সাফল্যের ভবিষ্যত।

অধিবৃত্তাকার বিশাল এই আয়নাটি গোলীয় অপেরণ আটকে দিতে সক্ষম হলেও কোমা ও অ্যাস্টিগমাটিজম থেকে মুক্ত হতে পারে না। যার কারণে মূল আয়নাটিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা থাকে। ফলে সম্পূর্ণ আলোক রশ্মি সঠিক ফোকাসে মিলিত হয়। ফলে স্পষ্ট প্রতিবিম্ব তৈরী হয়।

জেমস ওয়েবের বিশেষ ক্ষমতাগুলোর মূলে আছে চারটি ডিটেক্টর।

প্রথমে যেটির কথা বলবো সেটি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, MIRI ডিটেক্টর। এটি অতিদূরের মহাজাগতিক বস্তু এবং সৌর জগতের বাইরের গ্রহ সনাক্ত করতে পারে। মোটা মাত্রার বর্ণালী বিশ্লেষণ এর ক্ষমতা আছে এতে। এটি করোনা গ্রাফ নামক পদ্ধতি ব্যবহার করে তারাদের আলোককে মাস্কিং করে গ্রহ থেকে আসা অবলোহিত তরঙ্গ ডিটেক্ট করতে পারে।

দ্বিতীয় ডিটেক্টরটি হলো NIRCam (Near Infrared Imager)। যা কাজ করবে ০.৬ থেকে ৫ মাইক্রোমিটার পর্যন্ত। এটি নক্ষত্রর থেকে আগত আলোক রশ্মিকে একত্রীভূত করবে। যার জন্য ১৮ টুকরো আয়নার পিছনে থাকা ১৮টি মোটরকে সঠিক নির্দেশ দেবে। যাতে তাদের অবস্থান একদম সঠিক হয়। বিভিন্ন লেন্স ব্যবহার করে মহাজাগতিক বস্তুর সব চেয়ে ভালো ফোকাস করাও এর প্রধান কাজ। NIRCam পারদক্যাডমিয়ান-টেলুরাইড (HgCdTe) যৌগ দিয়ে তৈরি একটি ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলবে, কিন্তু সেটির পূর্বে আলোক রেখাকে ফোকাস করার জন্য লিথিয়াম ফ্লোরাইড, বেরিয়াম ফ্লোরাইড ও জিঙ্ক সেলেনাইডের লেন্স ব্যবহার করবে।

তৃতীয় ডিটেক্টরটি হলো NIRSpec (Near Infrared Spectrograph)। এই ডিটেক্টরটির কাজ হবে ০.৬ থেকে ৫ মাইক্রোমিটার পর্যন্ত আগত তরঙ্গের বর্ণালী বিশ্লেষণ করতে। ১ ন্যানমিটারেরও কম সুক্ষতায় ১০০টি খগোল বস্তুর বর্ণালী এটি সমান্তরালভাবে তৈরি করতে পারে।

চতুর্থ ডিটেক্টরটি হল FGS-NIRISS (Fine Guidance Sensor and Near Infrared Imager and Slitless Spectrograph)। এটির একটি কাজ হল কোনো নির্দিষ্ট তারাকে দৃষ্টিগোলকের মধ্যে রেখে সেই তথ্য জেমস এর ACS (Attitued Control System) ব্যবস্থাকে জানানো যাতে দুরবীনটি আকাশের একটি নির্দিষ্ট দিকে স্থিত করা যায়।

জেমস এর পুরো ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য আছে উন্নতমানের ইলেক্ট্রনিক্স প্রসেসর। যা মূলত পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ রাখবে। টেলিস্কোপটির দিক ঠিক করবে। তাপ নিয়ন্ত্রণ করবে। ডিটেক্টর থেকে তথ্য আহরণ ও বিশ্লেষণ করবে। আর সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিন ব্যবস্থাকে পরিচালনা করবে। তবে ব্যবস্থাটির মেমোরি বেশ কম। তাই প্রতিদিন বেশ কয়েকবার পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ করে তথ্য পাঠাতে হবে ওয়েবকে। সেজন্য একটি উন্নত মানের অ্যান্টেনাও জোড়া হয়েছে জেমস এর সাথে।

আধুনিক প্রকৌশল বিদ্যাকে সঙ্গী করে মহাবিশ্বের রহস্য উদ্‌ঘাটনের যে দায়িত্ব জেমস ওয়েবকে দেওয়া হয়েছে তা সফল হতে আর কয়েকটা মাসের অপেক্ষা। হাবল পেরেছে নিজেকে উজাড় করে দিতে। সভ্যতাকে মহাকাশ নিয়ে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছিলো সে। জেমস এবার কাঁধে তুলে নিতে চলেছে তার উত্তরসূরির অসমাপ্ত কাজ। সফল হবে এটাই আশা রাখে সারা বিশ্ব। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে আমরা বিগ ব্যাং বা এলিয়ান রহস্যের আরো কাছে পৌছে যেতে পারবো। রহস্যে ভরা পালসার তারা, নিউট্রন স্টার, শ্বেত বামন, সুপারনোভা, হাইপারনোভা, কৃষ্ণ গহ্বর বা গামা রেব্লাস্ট একদিন মানুষের কাছে সহজ হয়ে যাবে। বর্তমানে জেমস পৌঁছে গেছে তার নিজের অরবিটে। আর তারপর শুরু করেছে তাপমাত্রা কমিয়ে তার বিশাল আয়নাগুলো মেলে ধরতে। জেমস এর গরম দিকটার উষ্ণতা সর্বোচ্চ 310K এবং ঠান্ডা দিকটার উষ্ণতা 40K এর মত। ■

অনুপ্রেরণা ঃ

১. https://www.nasa.gov/mission_pages/webb/main/index.html

২. https://www.jwst.nasa.gov/

৩. জেমস ওয়েব দুরবিন : প্রথম গ্যালাক্সির খোঁজে By দীপেন ভট্টাচার্য

৪. https://www.space.com/news/live/james-webb-space-telescope-updates

৫. https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Webb

সমাজ দর্পণ ঃ

হিজাব বিতর্ক এবং তার উৎস সন্ধান

– রাজদীপ ঘোষ

তটীয় কর্ণাটকের উডুপী জেলার সরকারী মহিলা প্রি. ইউনিভার্সিটি কলেজের এক ঘটনা রাজ্য-দেশ ছাড়িয়ে এখন আন্তর্জাতিক বিতর্কে পরিণত হয়েছে। আপাতভাবে ঘটনা হল ঐ কলেজ কর্তৃপক্ষ কলেজের পোশাক (ইউনিফর্ম) নীতির উল্লঙ্ঘন হচ্ছে এই যুক্তিতে ৬ জন (অন্যমত অনুযায়ী ৮ জন) মুসলিম ছাত্রীকে শ্রেণীকক্ষে (ক্লাশরুম) হিজাব পরে ঢুকতে বাধা দেয়। ঐ ছাত্রীরা হিজাব পরে ক্লাশ করতে দেওয়ার দাবিতে অনড় থাকে। কলেজ ক্যাম্পাসের মধ্যেকার এই বিবাদ-বিতর্ক, রাস্তার বিক্ষোভ, সরকারের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ, বন্‌ধ, অবরোধ, কর্ণাটক হাইকোর্ট হয়ে এখন সুপ্রিম কোর্টের দরজায় এসে ঠেকেছে। এর সাথে সাথে পক্ষ ও প্রতিপক্ষের হয়ে রাজনৈতিক পার্টিসমূহ, ধর্মীয় সংগঠনসমূহ, প্রচার মাধ্যম এবং সরকারী তন্ত্র মাঠে নেমে পড়েছে। স্বাভাবিকভাবে আমজনতাও এই বিবাদের আঙিনায় এসে পড়েছেন বা পড়তে বাধ্য হয়েছেন। সুতরাং পরিস্থিতির দাবি হল 'হিজাব' বিবাদে সমাজ সচেতন-বিজ্ঞান সচেতন প্রগতিশীল অবস্থান কী তা নির্ধারণ করা।

বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা এটাই বলে যে কোন ঘটনা বা প্রক্রিয়ার আশু বা তাৎক্ষণিক বহিঃপ্রকাশ থেকে, কোন পরীক্ষার উপস্থিত ফলাফল দেখে সঠিক সিদ্ধান্তে আসা যায় না। সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে গেলে ঐ ঘটনা-প্রক্রিয়া বা পরীক্ষার উৎস-ইতিহাস-গতিমুখ জানা দরকার। তাহলে ভবিষ্যৎ ঘটনাক্রমের একটা ধারণা পাওয়া যায় এবং কর্তব্য কর্ম নির্দিষ্ট করা যায়।

হিজাব বিবাদের বর্তমান ঘটনাক্রম

ঐ কলেজ কর্তৃপক্ষের বক্তব্য শুরু থেকেই ঐ প্রতিষ্ঠানে অভিন্ন পোশাক বিধি (ইউনিফর্মের ড্রেস কোড) আছে। যা মাথা ঢাকার স্কার্ফ (হেড স্কার্ফ) অনুমোদন করে কিন্তু হিজাব অনুমোদন করে না। কলেজের অধ্যক্ষ রুদ্রগৌড়া সাংবাদিকদের কাছে বলেছেন "আমরা কলেজের অভ্যন্তরে এমনকি ক্লাশের মধ্যেও হিজাব পরার অনুমতি দিয়েছি। নিয়মটা হল কেবল ক্লাস চলাকালে তাদের সরিয়ে নিতে হবে"। [দ্রঃ হিন্দুস্তান টাইমস, ১৭ই ফেব্রুয়ারি, ২০২২]। কলেজের নিয়ন্ত্রক কলেজ ডেভলপমেন্ট কমিটির (সিডিসি) উপাধ্যক্ষ যশপাল সুবর্ণর বক্তব্য হল 'যারা হিজাব পরে আসবেন তাদের চেঞ্জিং রুমে হিজাব সরিয়ে নেবার অনুমতি আছে। কিন্তু শ্রেণীকক্ষে যাওয়ার অনুমতি নেই।'

হিজাব পরিধান করে আসতে চান যাঁরা সেই ছাত্রীদের বক্তব্য হল – প্রথম বর্ষের ক্লাশ করার সময় তারা বোরখা পরে আসতেন এবং ক্লাশ শুরুর আগে লেডিজরুমে ছেড়ে দিতেন। সেপ্টেম্বর ২০২১-এ এদের কয়েকজন বর্তমান কলেজ ইউনিফর্মে ওড়না দিয়েই মাথা ঢেকে ক্লাশ করতে চান। আলাদা রং বা উপাদানের হিজাব ব্যবহার করবেন না জানানো সত্ত্বেও কলেজ তা প্রত্যাখ্যান করে। আলিয়া আসকাদি নামের প্রতিবাদকারী দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী সংবাদ মাধ্যমে জানান 'শিক্ষকরা বাজে ব্যবহার করছিলেন। নীচু গ্রেড দিচ্ছিলেন। ক্লাশে মাথার স্কার্ফ টেনে দিচ্ছিলেন এবং ক্লাশের বাইরে বার করে দিচ্ছিলেন। ছাত্রী এবং অভিভাবকদের বক্তব্য আগে শ্রেণীকক্ষে মাথার স্কার্ফ ব্যবহার করা যেত, কোন বিরোধিতা ছাড়াই। এ.এইচ আলমেস নামের একজন প্রতিবাদী ছাত্রী বলেন 'আমি ৩-৪ বছর বয়স থেকে হিজাব পরছি। এখন আমাদের বুনিয়াদী মৌলিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে।' নভেম্বরে করোনা

মহামারির সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় কলেজ বন্ধ হয়ে যায়। ডিসেম্বরের শুরুতে অভিভাবকরা কলেজ কর্তৃপক্ষের সাথে বৈঠক করলেও তা ফলপ্রসূ হয়নি। ২৭শে ডিসেম্বর কলেজ পুনরায় খুললে ঐ ছাত্রীরা হিজাব পরে আসেন ও বিতর্ক শুরু হয়। ১লা জানুয়ারী কলেজের সিডিএমসি শ্রেণীকক্ষে হিজাব পরিধান করার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে ক্যাম্পাস ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়া (সিএফআই) – যারা পপুলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়া (পিএফআই) এর ছাত্র সংগঠন রূপে পরিচিত – তারা ঐ ছাত্রীদের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে প্রতিবাদের হুমকি দিলে কলেজে পুলিশ অবতীর্ণ হয়। ১৩ই জানুয়ারি ঐ ছাত্রীরা হিজাব পরিধান করে শ্রেণীকক্ষের বাইরে প্রতিবাদ বিক্ষোভ শুরু করেন। ১৫ই জানুয়ারি পার্শ্ববর্তী চিকমাগালুর জেলা থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন জায়গায় পাল্টা অভিযান শুরু করা হয়। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি) ও অন্যান্য হিন্দুত্ববাদী সংগঠনসূহের তরফ থেকে গলায় গেরুয়া স্কার্ফ পরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করা হতে থাকে। বিভিন্ন জায়গায় দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল টানাপোড়েন শুরু হয় এবং ফুলে ফেঁপে উঠতে থাকে। ৩রা ও ৪ঠা ফেব্রুয়ারি কুন্দাপুরে হিজাব পরিহিতা ছাত্রীদের ক্লাশের বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখার ছবি সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিবাদে ঐ শহরেরই ডিগ্রি কলেজের গেটে ৪০ জন ছাত্রী হিজাব পরে আসে। রক্ষীরা প্রবেশাধিকার না দেওয়ায় বিতন্ডা শুরু হয়। আবির্ভাব ঘটে একশোর বেশি গেরুয়া স্কার্ফ বাহিনীর।

সময়ের উপযুক্ততা বিচার করে বিজেপি নেতৃত্বাধীন কর্ণাটকের রাজ্য সরকার ৫ই ফেব্রুয়ারি স্কুল কলেজে অভিন্ন পোশাক নির্দেশিকা জারি করে। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দের কর্ণাটক শিক্ষা আইন মোতাবেক প্রাইভেট কলেজে বিনা ব্যতিক্রমে কর্তৃপক্ষের নির্দিষ্ট করে দেওয়া ইউনিফর্ম পরেই আসতে হবে। সমস্ত প্রি ইউনিভার্সিটি কলেজে কলেজ ডেভলপমেন্ট কাউন্সিল (সিডিসি) দ্বারা স্বীকৃত পোশাক পরে আসতে হবে। সরকারী স্কুলে সরকার অনুমোদিত পোশাক পরে আসতে হবে। যে প্রতিষ্ঠানে কোন পোশাক বিধি নেই সেখানে সমতা, একতা রক্ষা করে এবং অঞ্চলের আইন-শৃঙ্খলায় প্রভাব ফেলেনা এমন পোশাক পরতে হবে।

কর্ণাটক সরকারের পোশাক নির্দেশিকা কাঙ্খিত ফললাভ করে। পরিস্থিতি আরো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। হিজাব পরে আসা প্রতিবাদী ছাত্রীদের সংখ্যা প্রচুর বেড়ে যায়। তাদের দাবিয়ে দিতে গেরুয়া স্কার্ফধারীরাও সংখ্যায় আর উগ্রতায় বেড়ে ওঠে।

কর্ণাটক সরকারের পোশাক বিধি এবং প্রচলিত রীতি

কর্ণাটক শিক্ষা আইনের (১৯৮৩) ১৪৫(১) ধারা অনুযায়ী স্কুল ছাত্রদের পোশাক রাজ্য সরকার স্থির করে দেয়। স্কুল কর্তৃপক্ষ রঙ পছন্দ করতে পারে। প্রি ইউনিভার্সিটি কলেজে সরকার পোশাক নির্দিষ্ট করে দেয় না। কলেজ ডেভলপমেন্ট কমিটি সেটা নির্দিষ্ট করে। ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে প্রি ইউনিভার্সিটি বিভাগ সার্কুলার দিয়ে জানায় যে ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে 'ইউনিফর্ম' পরতে বলার দরকার নেই। যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে পোশাক বিধি ছিল তারা এতে আপত্তি করে। [দ্রঃ টাইমস অফ ইন্ডিয়া ২৮.০৫.২০১৯]

কর্ণাটকে ১৯৮০-র দশকে তৎকালীন জনতা পার্টি সরকারের শিক্ষামন্ত্রী এম. রঘুপতি জানিয়েছেন সরকারী নির্দেশে হিজাব ও ক্রিশ্চানদের নান'স হ্যাবিট রাখার সংস্থান ছিল।

১লা জানুয়ারি ২০২২ এ হিজাব পরিহিতা ছাত্রীদের যখন ক্লাশ করতে দেওয়া হয়নি তখনই কলেজ ডেভলপমেন্ট কমিটি (সিডিসি)-র অধ্যক্ষ তথা বিজেপি'র স্থানীয় এমএলএ রঘুপতি ভাট স্পষ্টই জানিয়ে দেন 'ওদের ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দিয়ে দেওয়া হবে এবং যেখানে (হিজাব পরার) অনুমতি আছে সেই কলেজে চলে যেতে পারে। কিন্তু আমাদের নীতি হল পরিষ্কার, শ্রেণীকক্ষে হিজাব চলবে না।'

৪ঠা ফেব্রুয়ারি কুন্দাপুরে গেরুয়া বাহিনীর যে বিক্ষোভ হয় তার এক অংশগ্রহণকারী সংবাদ মাধ্যমের জিজ্ঞাসার উত্তরে জানায় 'হ্যাঁ তারা আগেও হিজাব পরতো। তখনও আমরা প্রতিবাদ করেছিলাম।'

তথ্য বলছে ২০১১-১২ খ্রিস্টাব্দে হিজাব পরতে চাওয়ায় একজনকে সারাবছর ক্লাশ করতে দেওয়া হয়নি।

সুতরাং উপস্থাপিত তথ্য থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে মুসলিম ছাত্রীদের হিজাব পরিধান করা নিয়ে বিরোধিতা-আপত্তি আগে থেকেই ক্ষীণ হলেও বহমান ছিল। দ্বিতীয়তঃ আইন-কানুন পোশাক বিধি যাই থাক ইচ্ছুক মুসলিম ছাত্রীরা মাথা ঢেকে শ্রেণীকক্ষে ক্লাশ করতেন বিশেষ বিরোধিতা ছাড়া।

এখানে একটা প্রশ্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেটা হল বর্তমান বিতর্কের আঁতুরঘর যে উডুপী কলেজ সেখানে ৭০ জন মুসলিম ছাত্রী রয়েছেন। যার মধ্যে ৮ জন হিজাব পরার অধিকার চেয়ে প্রতিবাদ করেছিলেন। বাকিরা বিতর্কের সময়ও ক্লাশ করছিলেন। তথ্য বলছে অল্প সংখ্যক মুসলিম ছাত্রী ক্লাশে হিজাব পরতেন। কর্ণাটকে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলিম মহিলাদের উপস্থিতির সংখ্যা ২০০৭-০৮ এ ১% থেকে বেড়ে ২০১৭-১৮ তে ১৬% এ দাঁড়িয়েছে।

তৃতীয়তঃ হেড স্কার্ফ শ্রেণীকক্ষেও চলবে আবার লেডিজরুমে হিজাব ছেড়ে আসতে হবে – উডুপীর কলেজ অধ্যক্ষ আর সিডিসি কর্তাদের বক্তব্য থেকে অস্বচ্ছতা আর পরস্পরবিরোধিতা স্পষ্ট। অর্থাৎ ডিসেম্বর মাসের বহু আগে থেকেই ছাত্রীদের একাংশের আপত্তি ও অভিভাবকদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল তাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

চতুর্থতঃ সমগ্র কর্ণাটক রাজ্যেই হিজাব পরা যাবে অথবা যাবেনা এমন কোন নির্দেশিকা নেই। বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষ-অধ্যাপকরা (বেশিরভাগই নাম না প্রকাশ করার শর্তে) সংবাদমাধ্যমের কাছে এই কথাই বলেছেন।

পরবর্তী ঘটনাক্রম

৫ই ফেব্রুয়ারি কর্ণাটক সরকারের নির্দেশিকা জারী হতেই প্রতিবাদী ছাত্রীদের ৫ জন কর্ণাটক হাইকোর্টে তার বিরুদ্ধে আবেদন করেন। বিক্ষোভ পাল্টা বিক্ষোভ সামলাতে উডুপীতে ১৪৪ ধারা জারী করা হয়। শেষে ৮ই ফেব্রুয়ারী দেবেনগোড়া-হরিহড়া সহ বিভিন্ন শহরে পাথর ছোড়াছুড়ি শুরু হলে কর্ণাটক সরকার সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়। ১০ই ফেব্রুয়ারি কর্ণাটক হাইকোর্টের বিচারপতিরা অন্তর্বর্তী আদেশে বলেন আবেদন সমূহের চূড়ান্ত বিচারের আগে কোন ধর্ম বা বিশ্বাসের ভিত্তিতে শ্রেণীকক্ষে গেরুয়া চাদর, স্কার্ফ, হিজাব বা ধর্মীয় পতাকা ব্যবহার করা যাবে না। ঐ দিন থেকে ২৫শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এগারো দিন ধরে ২৩ ঘন্টা শুনানি চলার পর আদালত রায়দান স্থগিত রাখে।

হাইকোর্টের কাছে আবেদনকারীদের বক্তব্য ছিল – * হিজাব পরিধান করা একান্ত প্রয়োজনীয় ধর্মীয় প্রথা। তাই রাজ্য সরকারের 'নির্দেশিকা ধর্মের ভিত্তিতে বিদ্বেষমূলক মনোভাবের নামান্তর। * তাদের শ্রেণীকক্ষে হিজাব পরতে নিষেধ করা যায় না কারণ এমন কোন ও আইন নেই। * এই নিষেধাজ্ঞা সংবিধানের ধারা-২৫ অনুযায়ী ধর্মাচরণের স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী।

সরকার বিভিন্ন আদালতের বিভিন্ন মামলা ও তার রায়কে তুলে ধরে বলে – * হিজাব একান্ত প্রয়োজনীয় ধর্মীয় প্রথা নয়। এছাড়া যে কোন প্রথাকে সাংবিধানিক নৈতিকতা ও ব্যক্তি বিশেষের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। * প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা মেনে চলার স্বার্থে ধর্মাচরণের স্বাধীনতাকে যুক্তিসংগত সীমায় আবদ্ধ রাখার সংস্থান সংবিধানে আছে। * শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা নিশ্চিত করার স্বার্থে ধর্মীয় পরিচ্ছদ নিষিদ্ধ করে পোশাক বিধি তৈরী করতে পারে।

১৫ই মার্চ কর্ণাটক হাইকোর্ট সমস্ত বিষয়েই আবেদনকারীদের বক্তব্য খারিজ করে দিয়ে সরকারের নিষেধাজ্ঞাকে ন্যায়সঙ্গত বলে রায় দিয়েছে। রায়ে বলা হয়েছে – হিজাব পরিধান ইসলামের একান্ত প্রয়োজনীয় ধর্মীয় প্রথা নয় তাই তা সংবিধানের ২৫নং ধারা অনুযায়ী ধর্মাচরণের সুরক্ষা পাওয়ার অধিকারী নয়। আদালত সরকারের নিষেধাজ্ঞাকেও ন্যায়সঙ্গত মনে করেছে। এছাড়াও আদালত তার রায়ে হিজাব বিতর্কে সামাজিক অস্থিরতা ও অসদ্ভাব তৈরীর উদ্দেশ্যে 'অদৃশ্য হাত' থাকার সম্ভাবনার কথাও উল্লেখ করেছে।

কর্ণাটক হাইকোর্টের এই রায়কে কণাটক সরকার এবং হিজাব বিরোধী হিন্দুত্ববাদীরা দুহাত তুলে সমর্থন করেছে। মুসলিম ধর্মীয় সংগঠন-সংস্থা সমূহ বিরোধিতা করেছে বা হতাশা ব্যক্ত করেছে।

'হিজাব' বিতর্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্য কী?

তথ্য বিশ্লেষণ করলে নেহাত পক্ষপাত দুষ্ট কেউ ছাড়া বাকি সকলেই সহমত হবেন যে এটা এক পরিকল্পিত বিতর্ক। কেন এই পরিকল্পনা কর্ণাটক রাজ্যে বিশেষতঃ তটীয় কর্ণাটকে কার্যকরী হল সেটাও বিচার্য।

সমগ্র দক্ষিণ ভারতের মধ্যে ১৯৯০-এর দশকে শুরু হওয়া রাম জন্মভূমি পুনর্নির্মাণ আন্দোলনের সর্বাধিক প্রভাব পড়েছিল কর্ণাটকে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি) মিলিতভাবে কর্ণাটকে এই ইস্যুকে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় নিয়ে আসে। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্বরূপে ভূমিকা রাখে তটীয় কর্ণাটকের উডুপীর পেজাওয়ার মঠের বিশ্বেশতীর্থ স্বামী। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে রাম জন্মভূমি আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট দাঙ্গায় উডুপীতে পাঁচ জনের মৃত্যু হয়। এই জেলায় মুসলিম জনসংখ্যা ৮.২২%। আগে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ কম থাকলেও ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে বাবরি মসজিদ ধ্বংসকালীন সময়ে দেখা যায় বিভাজন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে স্থানীয়ভাবে উভয় সম্প্রদায়ের দ্বারা ব্যবহৃত কথ্য ভাষার মধ্যেও বিভাজন ঘটেছে। গ্রামীণ পরম্পরাগত উৎসব-অনুষ্ঠান থেকে মুসলিম জনগোষ্ঠী বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আবার দরগাগুলো, যা উভয় ধর্মের অবাধ গতিবিধির পরিসর ছিল তাও কেবল মুসলিমদের জন্য সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। ভিএইচপি, আরএসএস-এর সাথে সাথে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে বজরঙ্গ দল, হিন্দু জাগরণ, হিন্দু যুবা সেনা ইত্যাদি। বিশেষভাবে মুসলিম বণিক সম্প্রদায় বেরীদের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে লক্ষ্যবস্তু করা হতে থাকে। গো-রক্ষার ইস্যুকে সামনে তুলে নিয়ে আসা হয়। ব্যাপকভাবে প্রচারিত হতে শুরু করে 'লভ জিহাদ' ইস্যু। সংখ্যাগুরুর উগ্রধর্মবিদ্বেষ দুতরফা লাভ দেয়। প্রথমতঃ তা হিন্দু ধর্মীদের বাকি সব বৈশিষ্ট্যকে পেছনের সারিতে রেখে ধর্মীয় লাইনে সংগঠিত করে। অন্যদিকে সংখ্যালঘুদের মধ্যেও কট্টর মৌলবাদীদের প্রাধান্য সৃষ্টি করে দেয়। উদার মনস্ক-সংস্কারহীন অংশকে বিচ্ছিন্ন-প্রান্তিক করে তোলে। এই প্রকরণ মেনেই কর্ণাটকে মুসলিম সমাজের কট্টর ধর্মবাদী অংশ একই লাইনে সংগঠিত হওয়ার কার্যক্রম নেয়। কথিত রূপে পিএফআই এর ছাত্র মোর্চা ক্যাম্পাস ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়া (সিএফআই) সক্রিয় হয়ে ওঠে। ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে সারা ভারত মেডিক্যাল প্রবেশিকা পরীক্ষায় হিজাব-বোরখা নিষিদ্ধ করার বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ বিক্ষোভ সংগঠিত করে। উডুপীর কলেজ কর্তৃপক্ষ এদেরকেই প্রধান উস্কানিদাতা রূপে চিহ্নিত করেছে।

স্বভাবতই দক্ষিণ ভারতের মধ্যে বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকার কর্ণাটকেই গঠিত হয়েছে। কালবুর্গী, গৌরী লঙ্কেশদের হত্যা করা হয়েছে। বিবাহের জন্য ধর্ম পরিবর্তন যেখানে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। একথাও অস্বীকার করা যাবে না যে অন্যান্য তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দল দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই শক্তিসমূহ সম্পূর্ণ মদত পেয়েছে। এটাও মনে রাখতে হবে যে কেবল মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে নয় সংখ্যালঘু খ্রিষ্টানদের গীর্জা ভেঙে দেওয়া, প্রার্থনাস্থলে গিয়ে তান্ডব করার ঘটনা সারাভারতে সবথেকে উগ্রভাবে প্রকাশিত হচ্ছে কর্ণাটকে।

হিজাব বির্তক এবং নারী প্রসঙ্গ

ধর্মীয় বিদ্বেষের এমন আবহাওয়ায় অনিবার্যভাবে উভয় পক্ষের ধর্মান্ধরা নিজ ধর্মের নারীদের সংরক্ষিত করার কার্যক্রম গ্রহণ করে। লভ জিহাদ হল তারই এক বহিঃপ্রকাশ। সংখ্যাগুরুর ক্ষমতায় তাকে আইন সিদ্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। মুসলিম মহিলা হিন্দু চালকের গাড়িতে চেপেছে এমন অভিযোগে হামলা করার ঘটনা ও সামনে এসেছে। স্পষ্টতই এই মনোভাব আসে নারীকে সম্পত্তিরূপে দেখার মধ্যযুগীয় মানসিকতা থেকে। সমাজের অগ্রগতির স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ধর্ম নির্বিশেষে নারীরা যখন চার দেওয়ালের বদ্ধতা থেকে মুক্ত হচ্ছেন, সমাজের প্রত্যেক ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখছেন তখন এই পরিকল্পিত সাম্প্রদায়ীক বিদ্বেষ তাদের মধ্যেও পুরুষতান্ত্রিক কর্তৃত্ব ও ধর্মীয় আবদ্ধতাকে সুরক্ষামূলক এবং আত্মপরিচয়ের অভিব্যক্তিমূলক বলে মনে করতে শেখায়।গ্রহণযোগ্য করে তোলে।

হিজাব বিতর্কে বিজ্ঞান মনস্ক'র রায় কী?

প্রথমতঃ এই বিতর্ক বিশেষ ধর্মাবলম্বীদের টার্গেট করে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। হাইকোর্টের রায়ে বলা হয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা নিশ্চিত করার স্বার্থে ধর্মীয় পরিচ্ছদ নিষিদ্ধ করতে পারে। এক্ষেত্রে বলা দরকার কারও ব্যক্তিগত পরিধান অন্য ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাসে কোন আঘাত হানতে পারে না, তাই পরিচ্ছদ ধর্মনিরপেক্ষতায় বাধা হয় না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরস্বতী পূজার মত ধর্মীয় উৎসব, ধর্মীয় আলোচনা সভা, প্রার্থনাকালে ধর্মীয় স্তোত্র পাঠ, সিলেবাসে বেদ-উপনিষদ, ভগবৎ গীতা পাঠ ধর্মনিরপেক্ষতার পরিচায়ক? ভারত রাষ্ট্র ছদ্মধর্মনিরপেক্ষতার আড়ালে সংখ্যাগুরু ধর্মীয় সংস্কৃতির পক্ষে কাজ করে। প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতা হলো এমন রাষ্ট্রীয় নীতি যেখানে রাষ্ট্রের নাগরিকদের ব্যক্তিগতভাবে ধর্মাচরণের অধিকার থাকে কিন্তু রাষ্ট্র ধর্মীয় অবস্থান থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ রাখে। বলাই বাহুল্য কর্ণাটক সরকার বা আদালত প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ অবস্থান থেকে ভূমিকা রাখছে না।

দ্বিতীয়তঃ হিজাবপন্থী বা তিন তালাক প্রথা সমর্থনকারীরা এর বিরুদ্ধে পদক্ষেপকে তাদের ধর্মীয় অধিকারের উপর হস্ত ক্ষেপ বলে অসচেতন জনতাকে পাল্টাভাবে সংগঠিত করছেন। এই প্রচারে প্রভাবিত সংখ্যালঘুদের বিচার করতে হবে – এটা ধর্মীয় অধিকার নয়, দাসত্বের অধিকার। বিদ্যমান সমাজে মেয়েদের বিবাহের পূর্বে পিতার সম্পত্তি এবং বিবাহের পর স্বামীর সম্পত্তি মনে করা হয়। হিজাব, ঘোমটা, শাখা, সিঁদুর, ওড়না, বোরখা সকলই দাসত্বের চিহ্ন, স্বাধীনতার নয়।

তৃতীয়তঃ বিজ্ঞান মনস্ক, প্রগতিশীল সমাজ গড়ে ওঠে জনগণের চেতনার স্তরের ধাপে ধাপে ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে। চেতনা আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার বিকাশের পিছনে পড়ে থাকে। আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তন, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের সমাজের পরিবর্তন হওয়ার পরই সেই সমাজের মানুষের চেতনা বিকশিত হয়। তাই আইন করে বলপূর্বক 'ধর্মনিরপেক্ষ চেতনা' জাগানো যায় না।

চতুর্থতঃ হিজাব বিতর্ক বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসী মানুষদের মধ্যে বিভেদকে তীক্ষ্ণ করে মৌলিক সমস্যা থেকে দূরে সরিয়ে রাখার ঘৃণ্য অপকৌশল।

পঞ্চমতঃ এই বিতর্ক যত তীব্র হবে এবং হিন্দুত্ববাদের পক্ষে আইন গেলে মুসলমান মেয়েদের বড় অংশ পাবলিক শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ধর্মীয় শিক্ষার কবলে পড়বে, বাল্য বিবাহের সংখ্যা বাড়বে।

হিজাব বিতর্কে পরিকল্পনাকারীদের আগামী পদক্ষেপ

উড়ুপীর চর্চিত কলেজের পরিচালক সিডিসি'র উপাধ্যক্ষ যশপাল সুবর্ণ আদালতে যাওয়া ৬ জন ছাত্রীকে 'উগ্রপন্থী' এবং দেশদ্রোহী রূপে ঘোষণা করেছেন। পারিবারিক সূত্রে আরএসএস ঘনিষ্ঠ সুবর্ণ মহাশয় হিজাব বিতর্কের পরে তটীয় কর্ণাটকের উঠতি তারকারূপে চিহ্নিত হয়েছেন। মাছ ব্যবসার সমবায়ের অধ্যক্ষ এই ক্ষমতাশালী ব্যক্তি এবিভিপি, বজরঙ্গ দলে হাত পাকিয়ে গোরক্ষক বাহিনীর সর্দারের ভূমিকা পালন করেছেন। সিডিসি'র অধ্যক্ষ স্থানীয় বিধায়কের কথা আগেই জানা গিয়েছে।

ইতিমধ্যেই এই পরিকল্পনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আরএসএস-এর রাষ্ট্রীয় স্তর থেকে দাবি উঠেছে সর্বত্র অভিন্ন পোশাক বিধি করতে হবে। বিষয়টা এখানেও থেমে থাকবে না। এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে গোটা দেশজুড়ে আরো জোরদার করা হবে 'অভিন্ন দেওয়ানি বিধি' তৈরি করার আওয়াজ।

সুপ্রিম কোর্ট হিজাব মামলায় কি রায় দেবে তা ভবিষ্যৎই বলবে। তবে কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা রদ, এনআরসি-সিএএ মামলা, তিন তালাক রদ দিল্লি দাঙ্গায় অভিযুক্তদের বিচার তথা রামজন্মভূমি বিবাদ মামলার নিষ্পত্তি – ইত্যাদি যদি কোন গতিনির্দেশ করে

●*শেষাংশ ১২ পৃষ্ঠায় দেখুন* ➔

সমাজ দর্পণ ঃ

একবিংশ শতাব্দীতেও নৃশংস ধর্মীয় প্রথা 'চুরাল মুরিয়াল' চলছে

– নিবেদিতা হাজরা

দেশের মধ্যে সাক্ষরতার হার যে রাজ্যে সর্বাধিক, যে রাজ্যে দীঘকাল 'বামপন্থী' সরকার ক্ষমতায় থেকেছে, দক্ষিণ ভারতের সেই কেরালা রাজ্যে দীর্ঘ ২৫০ বছরের অধিক সময় ধরে নৃশংস ধর্মীয় উৎসব 'চুরাল মুরিয়া' এখনও রমরমিয়ে চলছে। প্রতিবছর মার্চ মাসের প্রথম অর্ধে কেরালা রাজ্যের আলাপ্পুজা জেলার ছেত্তিকুলাঙ্গারা দেবী মন্দিরে 'পুণ্য তিথি' 'কুম্ভ ভারানি'তে এক উৎসব হয়। এই উৎসবকে দক্ষিণভারতের কুম্ভমেলাও বলা হয়। হাজার হাজার নারী-পুরুষের সমাবেশের মধ্যে চলে এক মধ্যযুগীয় চরম বীভৎসতা। মন্দিরের দেবী ভদ্রকালী মাতাকে সন্তুষ্ট করতে এই উৎসবের অঙ্গ হিসাবে হয় 'চুয়াল মুরিয়াল' প্রথা পালন। যেখানে ৮-১৪ বছরের শিশু (বাচ্চা ছেলেদের) বলি দেওয়া হয়। শিশুদের রক্তে নাকি দেবী ভদ্রকালী প্রসন্ন হন!

দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা এই বীভৎস নৃশংসতার প্রতিবাদ বিভিন্ন মহল থেকে হওয়ায় ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে কেরালা রাজ্য কমিশন ফর প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটস্ (শিশুদের অধিকার রক্ষার জন্য গঠিত কমিশন) এই অনুষ্ঠানকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। কেরালা হাইকোর্ট এই আইনের বৈধতা স্বীকার করে তাকে মান্যতা দেয়। মন্দির কমিটি তা সত্ত্বেও ২০১৮ খ্রিস্টাব্দের মার্চে ২৪ জন বালককে তাদের আরাধ্য দেবী ভদ্রকালীর উদ্দেশ্যে চরম নৃশংসতার সাথে বলি দেয়।

ডেকান ক্রনিকাল, দ্য হিন্দু ইত্যাদি সংবাদপত্রের সাংবাদিকরা জানান ২০১৯ খ্রিস্টাব্দেও ২৬ জন বালককে পুনরায় হত্যা করা হয়। ২০২০ খ্রিস্টাব্দেও গোপনে এই ধর্মীয় হত্যালীলা সংঘটিত হয়েছে। ২০২০ খ্রিস্টাব্দের মার্চে 'চুরাল মুরিয়াল' এর উদ্দেশ্যে মার্চ মাসের গোড়ায় কিছু বালককে গোপন আস্তানায় রাখা হয়েছে এই খবর সংবাদপত্রে পুনরায় প্রকাশিত হয়। কেরালা হাইকোর্টে পুনরায় একজনের আবেদনের ভিত্তিতে হাইকোর্ট পুনরায় নিষেধাজ্ঞা জারি করলেও শিশু হত্যা বন্ধ হয়নি। সরকার ঐ মন্দিরের কর্মকর্তা, সাধু, পৃষ্ঠপোষক, পুরোহিত কাউকেই এখনও গ্রেপ্তার করেনি, মন্দির বন্ধও করা হয়নি। ফলে আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে এই উৎসব রমরমিয়ে চলছে একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতির যুগে!

২৫০ বছর ধরে চলে আসা 'চুরাল মুরিয়াল' নামক শিশুবলির ক্ষেত্রে বলা আছে যে নিজের শিশু পুত্রসন্তানকে দেবী ভদ্রকালীর উদ্দেশ্যে বলি দেওয়া প্রথা আছে পরিবার ও সমাজের সমৃদ্ধি ও মঙ্গল কামনার জন্য। কিন্তু চিরকালই সমাজের ধর্মভীরু ধনবান ব্যক্তিরা নিজের সমৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নিজ পরিবারের শিশু পুত্রসন্তানকে বলি না দিয়ে উৎসবের আগে হতদরিদ্র পরিবারের বালকদের জোর করে বা টাকার বিনিময়ে প্রথমে ক্রয় করে নেয় এবং পরে তাদের দত্তক পুত্র (আইন সঙ্গতভাবে নয়) হিসাবে গ্রহণ করে নাচ শিখিয়ে খাইয়ে পরিয়ে বলিদানের জন্য তৈরি করা হয়। ৮-১৪ বছরের এই শিশুদের কিনতে ৫০ হাজার, ১ লক্ষ, ৫ লক্ষ এমনকি ১০ লক্ষ টাকাও খরচ হয়।

এরপর উৎসবের দিন (কুম্ভ ভারানি)তে ওই শিশুদের রাজবেশে সাজান হয়, কাগজের মুকুট পরান হয় এবং নাচের তালে তালে মিছিল করে প্যারেড করিয়ে মন্দিরে আনা হয়। তীক্ষ্ণ সূঁচে সোনার তার পরিয়ে সেই তার দিয়ে বালকদের শিরদাঁড়ার দুপাশে (সামনে পিছনে) এবং অন্যত্র ফুটিয়ে রক্তের ফোয়ারা ছোটানো হয়। এরপর ভক্তদের মিছিলের মধ্যে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হয়। হাজার হাজার ভক্তদের (নারী-পুরুষ নির্বিশেষে) চিৎকার, বাজনার তীব্র আওয়াজ এবং ধর্মীয় স্লোগানের মাঝে শিশুদের আর্ত চিৎকার

চাপা পড়ে যায়। ধর্মীয় আফিমের উন্মাদনা এমন তীব্র হয়ে ওঠে যাতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে জনতার হৃদয়ে ঐ শিশুদের প্রতি ন্যূনতম সহানুভূতিও জাগতে দেখা যায় না। ধর্মীয় আফিমে বুঁদ হয়ে জনতা নিষ্পাপ শিশুদের বলি দিয়ে উৎসব করে। এরপর মন্দিরে পৌঁছে শরীরের বিভিন্ন অংশে বিধিয়ে দেওয়া তারগুলি টেনে টেনে খুলে নেয় ব্রাহ্মণেরা কারণ ওইগুলি সোনার তৈরি। এরপর রক্তাল্পতায় অর্ধমৃত শিশুদের ভগবান ভদ্রকালী দেবীর চরণে বলিদান করে 'পুণ্যকাজ' সম্পন্ন করা হয়! শিশুদের রক্তে তুষ্ট হয়ে নাকি (রক্তলোলুপ?) মা ভদ্রকালী ভক্তগণ এবং বিশেষত ওই শিশুদের পালিত পিতা-মাতা-দের আর্শীবাদ করেন! তাঁদের জীবন নাকি এতে সুখ সমৃদ্ধিতে ভরে ওঠে!

ধর্মের নামে, সনাতন ধর্মের ঐতিহ্যের নামে মধ্যযুগীয় বর্বরতা গত ২৫০ বছর ধরে চলে আসছে। নিজেদের প্রগতিশীল ও বামপন্থী বলে ঘোষণাকারী দলের সরকারের আমলেও চলছে এই শিশুবলি উৎসব! এই নারকীয় প্রথাকে সতীদাহ প্রথা থেকে কম পৈশাচিক বলবেন কি?

এই পৈশাচিক ধর্মীয় নৃশংসতার মধ্যেও কিন্তু শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শোষকের দ্বারা শোষিতের উপর চলে আসা পৈশাচিক উৎপীড়ণ ও নিপীড়ণের বীজ লুকিয়ে আছে। সমাজের সম্পত্তিবান শ্রেণীর মানুষ গায়ের জোরে এবং অর্থের বিনিময়ে নিরন্ন শোষিত-নিপীড়িত মানুষদের শিশুদের তুলে এনে বলি দেয় নিজেদের সমৃদ্ধির লোভে, প্রতিপত্তি বজায় রাখতে। আর রাষ্ট্র হয়ে থাকে কাঠের পুতুল, নয়ত আইনী নিষেধাজ্ঞা জারি করে নিজেদের হাত ধুলে ফেলে। পৈশাচিক ধর্মীয় উল্লাসের মাঝে ঐ শিশুদের আর্ত চিৎকার সমাজপতিদের কর্ণ বিদীর্ণ করে না। ঐসব ধর্মীয় স্থানে ভোটের আগে নেতা-মন্ত্রীদের মাথা ঠুকতে অর্থদান করতে দেখা যায়। হত্যাকারীরা শাস্তি তো পায়েই না উল্টে তাদের প্রতিপত্তি বাড়তে থাকে।

এখনও মানবিক মূল্যবোধহীন হয়ে পরেন নি এমন যে কোন মানুষ এই ধরনের ধর্মীয় নৃশংসতা দেখে চুপ থাকতে পারেন কি? পারেন না। প্রতিবাদ হয় না এমনও নয়। তবুও এই নৃশংসতা টিঁকে আছে। শুধু 'চুরাল মুরিয়াল' নয়, নানা ধর্মে নানা প্রকারে ধর্মীয় নৃশংসতা ও নিপীড়ণ জারি আছে। শুধু এদেশে নয় দেশে দেশে। শুধুমাত্র আইন করে এইসব নৃশংসতার অবসান সম্ভব নয়। শোষণ নিপীড়ণের উৎস এই শ্রেণীবিভক্ত সমাজ টিঁকে থাকবে আর 'চুরাল মুরিয়াল' এর মত নৃশংস হত্যাকান্ডের অবসান ঘটবে শুভবুদ্ধির উদয় ঘটিয়ে, এটা কল্পনা করা বিজ্ঞান মনস্কতা নয়। এই নৃশংসতার উৎসকে নির্মূল করেই এর অবসান ঘটানো যাবে। বিজ্ঞান আন্দোলনকে সেই লক্ষ্যেই এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ■

● *১০ পৃষ্ঠায় শেষাংশ*

হিজাব বিতর্ক এবং তার উৎস সন্ধান

তবে 'হিজাব'এ নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবার সম্ভাবনা খুবই কম একথা বলা বাহুল্য।

এটাও স্পষ্ট যে উগ্র ও আগ্রাসী ধর্মবাদীরা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, যুক্তিবাদী, নারী স্বাধীনতাকামীদের কোনঠাসা করে ফেলেছে। যে দেশে ৮৯% মুসলিম মহিলা আর ৫৯% হিন্দু মহিলা ঘরের বাইরে বার হলে মাথা ঢাকেন সেই দেশে তাদের প্রকারান্তরে 'হিজাব' এর পক্ষ নিতে বাধ্য করা হচ্ছে। একই ভাবে তারা তিন তালাক রদ করার দাবি তুলতে পারেননি, সমর্থনও করতে পারেননি।

বস্তুতঃ বর্তমানে ভারত সরকারের শাসক গোষ্ঠী একটা বৈজ্ঞানিক সত্যকেই বিপরীত মুখে প্রয়োগ করছে চরম আগ্রাসী রূপে। ৯৯% এর ওপর ১% এর শাসন বজায় রাখতে গেলে ধর্ম-বর্ণ-জাতি-আঞ্চলিকতা ভিত্তিক বিদ্বেষকে চরম স্তরে নিয়ে যেতে হবে। শুধু ভারতে নয় দুনিয়ার দেশে দেশে এই পদ্ধতি অনুশীলন করা হচ্ছে। জনসংখ্যার সংখ্যাগুরু ধর্ম-জাতি-ভাষাগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য-আচার-প্রথাগুলোকে সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে তাদের দমন করার জন্য।এর দ্বারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে যে কট্টর ভাষা-জাতি-ধর্মবাদ সৃষ্টি হচ্ছে তাকে রাষ্ট্রের আইন-বিচারব্যবস্থা ও সরকারী বাহিনী দ্বারা দমন করা হচ্ছে। বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা-মায়ানমার-পাকিস্তান থেকে আরব-ইজরায়েল-আফগানিস্তান-ইরাক-ইরান-আফ্রিকা ও ইউরোপ মহাদেশের রাষ্ট্রসমূহ – তালিকার শেষ নেই।

গতকাল যে ছাত্র-ছাত্রীরা একসাথে টিফিন ভাগ করে খেতো, সুখ-দুঃখ-আবেগ-হতাশা একসাথে ভাগ করে নিত, তারা এখন হিজাব বনাম ঘোমটা, ফেজ টুপি বনাম পাগড়ি, দাড়ি বনাম উত্তরীয় ইত্যাদি মুহূর্তে মুহূর্তে তৈরী করা ইস্যুতে পরস্পরের দিকে পাথর ছুড়ছে! এই আপাত বাস্তবতার ভেতরেও একটা সত্য রয়েছে। রোজগারের দাবিতে, শিক্ষাক্ষেত্রে ফী কমানোর দাবিতে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ইত্যাদি জনসমস্যা সম্বন্ধীয় অসংখ্য ইস্যুতে এঁরাই আবার ঐক্যবদ্ধ হবার ভিত্তি খুঁজে পাবেন। ঐক্যবদ্ধ হবেন। সমাজের প্রগতিশীল অংশ সুসংগঠিত রূপে জনগণকে প্রকৃত জন-সমস্যার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করার নিরন্তর প্রয়াসের মধ্যে দিয়েই এমন পরিস্থিতির পরিবর্তন করতে পারেন।■

বিশেষ নিবন্ধ ঃ

জিনের মহাফেজখানা

– শিশির কর্মকার

পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাবের পর থেকে আজ পর্যন্ত মোট কত প্রজাতি এসেছে আর কত প্রজাতির অস্তিত্ব চিরকালের জন্য বিলীন হয়ে গেছে তার সঠিক হিসাব এখনো বিজ্ঞানীদের কাছে নেই। তবে যে সমস্ত জীব ও উদ্ভিদ প্রজাতি বিলুপ্ত হয়েছে তাদের একদা অস্তিত্বের সাক্ষ্য এই পৃথিবী বহন করে চলেছে। পৃথিবীর জলে, স্থলে অন্তরীক্ষে ছড়িয়ে আছে সেই সব সাক্ষ্য প্রমাণ। বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে বিলুপ্ত বহু প্রজাতির আবির্ভাবের, টিকে থাকার ও অবলুপ্তির ইতিহাস আবিষ্কার করে চলেছে। এককোষী জীব থেকে বিশালকায় ডাইনোসর – সবই আছে এই তালিকায়। ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দে ফরাসী প্রকৃতিবিদ তথা প্রাণীবিদ জর্জেস ক্যুভিয়ার সর্বপ্রথম পৃথিবীতে জীবের আবির্ভাব ও বিলুপ্তির পর্যায়ক্রমিক প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াটি সকলের নজরে আনেন। বিভিন্ন গবেষণায় বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রধানত প্রাপ্ত জীবাশ্ম পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা এটিকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইনের বিবর্তনবাদের সঙ্গে যা সংপৃক্ত হয়েছে পরবর্তীকালে। এই বিলুপ্তি উভমুখী নয় বরং একমুখী। অর্থাৎ, কোন প্রজাতি একবার বিলুপ্ত হলে পুনরায় তার আবির্ভাব ঘটার নিদর্শন নেই। জীব ও উদ্ভিদ নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেবার মাধ্যমে অর্থাৎ অভিযোজনের মাধ্যমে। পরিবেশ সদা পরিবর্তনশীল। পরিবেশের পরিবর্তন ঘটলে, নতুন পরিবেশে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য অভিযোজন আবশ্যিক হয়ে পড়ে। ফল স্বরূপ এক প্রজাতি অন্য প্রজাতিতে বিবর্তিত হয়ে যেতে পারে অথবা নতুন পরিবেশে অভিযোজনে ব্যর্থ হয়ে ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। আবার, গণ-বিলুপ্তি অর্থাৎ একসাথে বহু প্রজাতির বিলুপ্তির ঘটনাও অস্বাভাবিক নয়। বিজ্ঞানীরা গবেষণালব্ধ তথ্য ও বিভিন্ন নিদর্শন পরীক্ষা করে দেখেছেন যে পৃথিবীর ইতিহাসে এমন ঘটনা ঘটেছে বার বার। এই গণ-বিলুপ্তির কারণগুলির মধ্যে রয়েছে খরা, বন্যা, তুষারপাত, উল্কাপাত, ভূমিকম্প ইত্যাদি। পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের বহু আগেই শুরু হয়েছিল এই প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া। তাই বিলুপ্তির কারণ মনুষ্যজনিত নয়। একই কারণে বর্তমান পৃথিবীতে মানুষসহ যে সমস্ত জীব ও উদ্ভিদ প্রজাতি বিরাজ করছে তাও কালের নিয়মে একদিন বিলুপ্ত হবে।

বিলুপ্তির বিষয়টি বিজ্ঞানের নজরে আসার পর থেকে বিপন্ন ও বিলুপ্তপ্রায় জীবজন্তু ও উদ্ভিদগুলিকে চিহ্নিত করতে শুরু করেন বিজ্ঞানীরা। জানার চেষ্টা করা হয়, কোন প্রজাতির সংখ্যা ভীষণ রকম হ্রাস পাচ্ছে, কোন প্রজাতি বিবর্তনের কোন স্তরে রয়েছে ইত্যাদি। দীর্ঘ বিবর্তনের পথ ধরে অস্তিত্বের শেষ প্রান্তে যে সমস্ত উদ্ভিদ বা প্রাণী অবস্থান করছে তারা স্বাভাবিক ভাবেই বিপন্ন ও বিলুপ্তপ্রায়। বিভিন্ন প্রজাতির বিপন্নতার স্তর ও তার কারণগুলিকে চিহ্নিত করে ও সেগুলিকে দূর করে জীব বৈচিত্রকে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্য থেকে সংরক্ষণ-এর ধারণা জন্ম নেয়। বন্য প্রাণী সংরক্ষণের জন্য প্রাণীকুল রক্ষার পাশাপাশি তার বাসস্থান অর্থাৎ অরণ্য সংরক্ষণ তত্ত্বের জন্ম হয়। দেশে দেশে বন্য প্রাণী ও অরণ্য সংরক্ষণ আইন রচিত হয় ও আইন লাগু করার বিশাল কর্মকান্ড শুরু হয়। আইনে বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা জারি করার ফলে বনজ ও প্রাণিজ সম্পদের উপর সাধারণ মানুষের অধিকার নতুন করে লঙ্ঘিত হতে থাকে। বিভিন্ন কারণে পৃথিবীব্যাপী বনাঞ্চল হ্রাস পেতে থাকে তাই এই উপায়ে বন্য প্রাণী তথা জীব বৈচিত্রকে দীর্ঘকাল টিকিয়ে রাখার বাস্তবতা নিয়ে ক্রমশঃ সংশয় দেখা দেয় বিজ্ঞানীদের মধ্যে। কারণ, প্রাকৃতিক নিয়মে প্রাণী ও উদ্ভিদ বৈচিত্রসহ পুরো পরিবেশটাই সদাপরিবর্তনশীল। পরবর্তীকালে জীববিজ্ঞান তথা জিন-তত্ত্বের বিকাশের সাথে সাথে সংরক্ষণের ধারণা বদলাতে থাকে। সমগ্র বনাঞ্চল বা আস্ত প্রাণীকুলকে সংরক্ষিত করার চেয়ে জিন-উপাদান সংরক্ষণ করা বাস্তবসম্মত ও বিজ্ঞানসম্মত বলে প্রতিষ্ঠিত। বর্তমান পৃথিবীতে দুইটি পদ্ধতিই সহাবস্থান করছে। তবে তা শান্তিপূর্ণ কিনা সেটা অন্য আলোচনার বিষয়।

জিন-উপাদান সংরক্ষণকে এক কথায় জিন ব্যাঙ্ক বলা হয়। প্রাণীদের ক্ষেত্রে করা হয় ডিম্বাণু ও শুক্রাণু সংরক্ষণ বা ক্রায়ো ব্যাঙ্ক। আর উদ্ভিদ সংরক্ষণ-এর উপায়গুলি হল, শস্য ভান্ডার, ইন ভিট্রো ব্যাঙ্ক, ক্রায়ো ব্যাঙ্ক, পরাগ-রেণু সংরক্ষণ ইত্যাদি। এর মধ্যে শস্যবীজ ভান্ডার গড়ে তুলে তা সংরক্ষণের ধারণা হল প্রাচীনতম। কৃষি-সভ্যতার শুরু থেকেই শস্যবীজ সংরক্ষণ করে পরবর্তীতে তা আবাদ করার অভ্যাস করে এসেছে মানুষ। অপটু সংরক্ষণের কারণে প্রকৃতিতে হারিয়ে গেছে বহু শস্যবীজ। মানব সভ্যতার সুদীর্ঘ কৃষি-ইতিহাসে হারিয়ে যাওয়া শস্যবীজ খুঁজে বের করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন বিজ্ঞানীরা। এর ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন দেশে গড়ে ওঠে জাতীয় শস্যবীজ ভান্ডার (সীড ভল্ট)। সারা বিশ্বে এর বর্তমান সংখ্যা হল ১৭৫০। আবার, পৃথিবীর

সকল দেশ থেকে প্রথাগত ও ঐতিহ্যগত শস্যবীজ সংগ্রহ করে প্রতিষ্ঠা করা হয় আন্তর্জাতিক বীজ ভান্ডার। মহাপ্রলয়ে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেলেও এই বীজ ভান্ডার মানুষের বেঁচে থাকার সর্বশেষ জীবন-রেখা হিসাবে সুরক্ষিত থাকবে। নরওয়ে-র স্পিটসবার্গেন দ্বীপে ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে তৈরী হওয়া আন্তর্জাতিক শস্যবীজ ভান্ডারটি সমুদ্রতল থেকে ১৩০ মিটার উচ্চতায় পাহাড় কেটে গড়ে তোলা হয় সুড়ঙ্গের মধ্যে। সেখানে – ১৮° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সুরক্ষিত রাখা রয়েছে বিশ্বের সমস্ত দেশ থেকে সংগ্রহ করা প্রায় দশ লক্ষ আশি হাজার শস্যবীজের নমুনা। পাহাড়ের মাথার বরফের চূড়া যদি সম্পূর্ণ গলে যায় তাহলে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি বীজ ভান্ডারের উষ্ণতা শূন্য ডিগ্রীর নীচে নামতে দেবেনা এবং শস্যবীজ সুরক্ষিত রাখবে ২০০ বছর পর্যন্ত। ৪৫ লক্ষ শস্যবীজ ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন এই আন্তর্জাতিক ভান্ডার একদিকে যেমন শস্যবীজ বৈচিত্রের এক অনন্য নিদর্শন, অন্যদিকে এটি মানুষের ১৩ হাজার বছরের কৃষি-সভ্যতার সাক্ষ্য বহন করছে।

অত্যন্ত সুরক্ষিতভাবে বানানো সত্বেও বিভিন্ন দুর্ঘটনায় কোন কোন দেশের বেশ কয়েকটি শস্যবীজ ভান্ডার ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ঘটনা রয়েছে। ধ্বংসের কারণগুলি হল প্রধানতঃ বন্যা, অগ্নিকান্ড ও যুদ্ধ। ফিলিপাইনের জাতীয় শস্যবীজ ভান্ডারটি টাইফুনের প্রভাবে বন্যার জল প্রবেশ করে ও পরবর্তীতে অগ্নিকান্ডের ফলে পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায় ও সমস্ত শস্যবীজ নষ্ট হয়ে যায়। আফগানিস্তান, সিরিয়া ও ইরাকের জাতীয় ভান্ডারগুলি যুদ্ধের কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে এবং এই দেশগুলির শস্যবীজের কোন নমুনা আন্তর্জাতিক শস্য ভান্ডারে সংরক্ষিত নেই। শস্যবীজ ভান্ডার গুলির ও বিশ্ববাজারের উপর আধিপত্য কায়েম রাখার লড়াইয়ে সামিল হয়েছে বিশ্বের তাবড় তাবড় সীড কোম্পানিগুলি। বিশ্বের প্রথম তিনটি সর্ববৃহত সীড কোম্পানী বিশ্বের পঞ্চাশ শতাংশ বাজার দখল করে আছে। এর মধ্যে আমেরিকান কোম্পানী মনস্যান্টো (বর্তমান নাম 'বেয়ার') একাই দখল করে আছে ২৩ শতাংশ বাজার।

সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন শস্য ভান্ডারগুলির স্থায়িত্ব নিয়ে। আরিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোবটিক এক্সপ্লোরেশন বিভাগের বিজ্ঞানীরা অন্ততঃ সাতটি কারণ উপস্থাপনা করেছেন যা শস্যভান্ডারগুলিকে ধ্বংস করতে পারে। সেগুলি হল, আগ্নেয়গিরি মহাউদ্গীরন, খরা, উল্কাপাত, আনবিক যুদ্ধ, অতিমারী, সৌর ঝড়ের প্রভাব ও জলবায়ু পরিবর্তন। তাই তারা প্রস্তাব দিয়েছেন যে জীব ও উদ্ভিদ বৈচিত্রকে রক্ষার করার জন্য আরও নিরাপদ জায়গার দরকার যেখানে জিন ব্যাঙ্ক স্থাপনা করা যেতে পারে। তবে পৃথিবীকে একেবারেই নিরাপদ মনে করছেন না বিজ্ঞানীরা। তাই পৃথিবীর নিকটতম প্রতিবেশী চাঁদের মাটিতে বানানোর প্রস্তাব দিয়েছেন এই সুবিশাল মহাফেজখানা। বর্তমান পৃথিবীর জীবমন্ডলে মোট প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ৮৭ লক্ষ। এর মধ্যে উদ্ভিদ, প্রাণী ও ছত্রাক মিলে মোট ৬৭ লক্ষ। পৃথিবীর জীব বৈচিত্রকে বাঁচিয়ে রাখতে বিজ্ঞানীরা আপাতত ৬৭ লক্ষ প্রজাতির জিন সংরক্ষণ করার প্রস্তাব দিয়েছেন। চাঁদের মাটির নীচে রয়েছে এক বিশাল সুড়ঙ্গ যার নাম 'লাভা টিউব'। চাঁদের সৃষ্টির সময় প্রাকৃতিকভাবে গড়ে ওঠা এই লাভা টিউব উল্কাপাত থেকে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত, নেই বন্যাজনিত সমস্যা। এমনকি জিনের গঠনকে নষ্ট করে দিতে পারে এমন ক্ষতিকর বিকিরণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এই টিউব। প্রায় দু'শটি এমন লাভা টিউবের সন্ধান রয়েছে বিজ্ঞানীদের কাছে। কিন্তু প্রশ্ন হল পৃথিবী থেকে জিন-উপাদানগুলি বহন করে চাঁদের বুকে স্থাপন করা হবে কিভাবে? বিজ্ঞনীরা জানিয়েছেন ৬৭ লক্ষ জিনের নমুনা বহন করার জন্য প্রায় ২৫০টি রকেটের প্রয়োজন। লাভা টিউবগুলি সংরক্ষণের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা হবে রোবটের মাধ্যমে যা পৃথিবী থেকে নিয়ন্ত্রিত হবে ও শক্তির উৎস হবে সম্পূর্ণভাবে সৌরশক্তি। মার্কিন গবেষণা সংস্থা নাসা ও ইউরোপীয় স্পেস এজেন্সী-র আগামী চন্দ্রাভিযানে এই মহান কর্মকান্ডের বাস্তবতা সরজমিনে যাচাই করে দেখা হবে।

এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা বাইবেলে উল্লিখিত মহাপ্রলয়ের কাহিনীর অবতারণা করেছেন। যে কাহিনীতে মহাপ্রলয়ের ভবিষ্যতবাণী ঘোষণা করে ঈশ্বর নোয়াকে বলেন 'পৃথিবী পাপে ভরে গেছে, তাই পৃথিবীকে পাপমুক্ত করতে আমি বন্যা সৃষ্টি করে সব পাপ ধুয়ে দেব। একটি বিশালাকার নৌকা বানিয়ে তাতে তোমার পরিবারের সব সদস্যদের নিয়ে উঠে যাও। আকাশের নীচে যত পশু পাখি আছে প্রত্যেকটির একটি করে স্ত্রী ও একটি করে পুরুষ প্রজাতি নিয়ে ও তাদের খাবারের জোগাড় নিয়ে তুমি নৌকায় উঠে পড়। বন্যার জল নেমে গেলে তোমরা নৌকা থেকে বেরিয়ে আসবে ও নিশ্চিন্তে বসবাস করবে। পাপমুক্ত পৃথিবী আবার সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা হয়ে উঠবে।

বিশ্বের প্রতিটি শস্যভান্ডার একদিকে যেমন মানব ইতিহাসের ঐতিহ্যের সাক্ষী। অন্যদিকে তার প্রতিটি দানায় দানায় লেখা আছে মানুষের লড়াইরে কাহিনী। রক্ত-ঘাম ঝরিয়ে চাষ করা ফসলের অধিকার যারা পায়নি তাদের উপর দাস মালিক, জোতদার, জমিদার, সামন্ত-প্রভু, পুঁজিপতিদের অত্যাচারের কাহিনী লেখা আছে প্রতিটি শস্য দানায়। সেই শস্যবীজ জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে যেখানেই থাকুক, মেহনতী মানুষই তার প্রকৃত মালিক। সমাজের অমোঘ নিয়মে শস্যের অধিকারের সাথে সাথে পুরো দুনিয়াটাই একদিন তার হবে। ■

লেনিনগ্রাদে অবস্থিত ভ্যাভিলভ ইন্সটিটিউট অব প্ল্যান্ট ইন্ডাস্ট্রীজ

লেনিনগ্রাদের শহীদ বিজ্ঞানীরা

১৯২১, রাশিয়ার জনগণ জার শোষণ শাসনের জোয়াল থেকে নিজেদের সবেমাত্র মুক্ত করেছে। যে সমাজ ছিল পূর্বের সমাজের থেকে একেবারেই আলাদা। প্রকৃত অর্থেই যা ছিল সাধারণ মানুষের। সমাজের মূল মন্ত্র ছিল সাধ্য মত দাও আর প্রয়োজন মতো নাও। এমন রাজার রাজত্ব এতদিন পৃথিবীর কেউ দেখেনি যেখানে সবাই রাজা। মানুষের খাদ্য সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা গবেষণার মধ্য দিয়ে গড়ে তুললেন সুবৃহৎ শস্যবীজ ভান্ডার যার নাম ভ্যাভিলভ ইন্সটিটিউট অব প্ল্যান্ট ইন্ডাস্ট্রীজ। যা দেখে চমকে গেল বিশ্বের মানুষ। লেনিনগ্রাদে গড়ে তোলা সংগ্রহশালাটিতে প্রায় এক লক্ষ সাতাশি হাজার উদ্ভিদ বীজ নমুনার মধ্যে ছিল প্রায় চল্লিশ হাজার প্রজাতির খাদ্যশস্য বীজ। উদ্ভিদ বিজ্ঞানী তথা রাশিয়ার মানুষের কাছে এই শস্য ভান্ডারটি ছিল অত্যন্ত গর্বের কারণ এটা ছিল আগামী পৃথিবীর ক্ষুধার্ত মানুষের খাদ্য সুরক্ষার অঙ্গীকার। আবার অন্যদিকে বিশ্বের শোষকদের কাছে এটি ছিল দর্পচূর্ণের ও পরাজয়ের প্রতীক। তাই হিংস্র শ্বাপদের দল তাদের নখ দাঁত বাগিয়ে হামলে পড়ল রাশিয়ার উপর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালে **১৯৪১** এর সেপ্টেম্বরে হিটলারের নেতৃত্বে জার্মান সেনাবাহিনী লেনিনগ্রাদ শহরকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেললে বীজ সংরক্ষণাগারে কর্মরত প্রায় ২৮ জন উদ্ভিদ বিজ্ঞানী কার্যত বন্দি হয়ে গেল। বাইরে জার্মান সেনার সঙ্গে লাল ফৌজের লড়াই আর ভিতরে বিজ্ঞানীদের শস্যবীজ রক্ষার লড়াই। গোলাগুলি ছিটকে এসে শস্য ভান্ডারের দরজা জানালা ভেঙ্গে গেলে দ্রুত মেরামত করা পোকা মাকড় ও আর্দ্রতার ফলে শস্যবীজ যাতে নষ্ট না হয়ে যায় তা অনবরত পরীক্ষা করা ইত্যাদি ছিল বিজ্ঞানীদের প্রত্যেক দিনের কাজ। অতি সন্তর্পনে চোরা পথ দিয়ে কিছু শস্যবীজ নিরাপদ স্থানে সরিয়ে দিতে সক্ষম হলেন বিজ্ঞানীরা। এদিকে শীতের তাপমাত্রা হ্রাস পেতে পেতে পৌঁছল − ৪০° ডিগ্রী সেলসিয়াসে। সংরক্ষণাগার বিদ্যুতহীন অন্ধকার স্যাতস্যেতে। আগুন জ্বালানোর জন্য শুকনো কাঠ কাগজ যা সঞ্চিত ছিল তা ক্রমশঃ কমে আসছে। খাবার দাবার যা সঞ্চিত ছিল ধীরে ধীরে নিঃস্ব হয়ে গেল। দীর্ঘদিন এই পরিবেশে থাকার ফলে ফুসফুসের সংক্রমণে একে একে অসুস্থ হয়ে পড়লেন বিজ্ঞানীরা। **১৯৪২** এর জানুয়ারীতে একে একে আঠাশ জন বিজ্ঞানী মারা গেলেন। শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত নিজেদের সবকিছু দিয়ে রক্ষা করে গেছেন তাদের বহু আদরের সংরক্ষণাগার তাতে যা শস্য ছিল তা খেয়ে তাঁরা আরও বেশ কিছুদিন নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতে পারতেন। কিন্তু তাঁরা সে পথ বেছে না নিয়ে অনাহারে মৃত্যু বরণ করার সিদ্ধান্ত নেন। শস্যভান্ডারে সঞ্চিত একটি শস্যদানাও তাঁরা নিজেদের খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করেননি। শস্য তথা উদ্ভিদ বৈচিত্রকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বিজ্ঞানীদের এই আত্মত্যাগ মানব সমাজের ইতিহাসে আর নেই। ■

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী ঃ

বৈজ্ঞানিক সত্য প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত প্রাণ এক মহান বিজ্ঞানী গ্যালিলিও গ্যালিলি

– পঞ্চানন মন্ডল

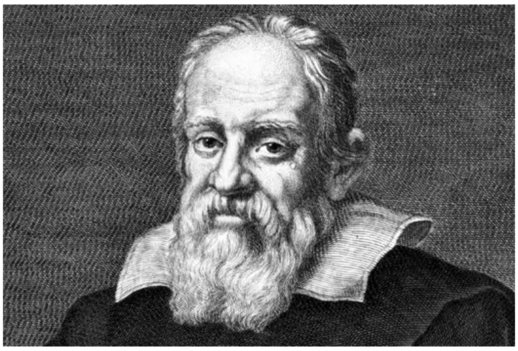

তিন শতাব্দীর বেশি সময় অতিক্রান্ত। তবু আজও পৃথিবীর জনমানসে এক উজ্জ্বল নাম গ্যালিলিও গ্যালিলি। গ্যালিলিও'র যুগান্ত কারী সব আবিস্কার, চিরায়ত অন্ধবিশ্বাস থেকে বেরিয়ে সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, সর্বসাধারণের কাছে তাঁকে করেছে অমর। বিজ্ঞান আর ধর্মের বিরোধপূর্ণ এক অস্থির সময়ে জন্মগ্রহণ করেও অসম সাহসিকতায় হাজারো প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে সত্য প্রতিষ্ঠা করতে বিজ্ঞানকেই বেছে নিয়েছিলেন গ্যালিলিও। তিনি ছিলেন একাধারে একজন গণিতবিদ, পদার্থবিজ্ঞানী, জ্যোতির্বিদ এবং দার্শনিক। তাঁকে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের জনকও বলা হয়। তবে সর্বোপরি তিনি ছিলেন মধ্যযুগের অজ্ঞতার বিরুদ্ধে বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের অন্যতম পুরোধা। অসাধারণ মানবতাবাদী একজন মানুষ।

গ্যালিলিও'র সময় ক্যাথলিক চার্চের অনুগামীরা ছিল সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি আর সেই সঙ্গে অত্যন্ত প্রভাবশালী। ক্যাথলিক চার্চের পোপরা সরাসরিই বিজ্ঞানের বিরোধিতা করতেন। বিজ্ঞানী বা দার্শনিকদের কোনো কথা বাইবেলের বিপরীতে গেলেই তাদের জীবনে নেমে আসত ঘোর অমানিশা। ব্যতিক্রম হয়নি গ্যালিলিওর ক্ষেত্রেও। তাঁকে অনেকবারই প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়। জীবনের শেষ আটটি বছর তিনি কাটিয়েছিলেন গৃহবন্দী হয়ে। নিষিদ্ধ করা হয় তার লেখা বইও। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয় হয় সত্যের। তা আমরা আজ সবাই বুঝতে পারছি।

পৃথিবীর সর্বকালের অন্যতম সেরা বিজ্ঞানী গ্যালিলিও গ্যালিলি ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারী ইতালির পিসা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন ভিনসেনজো গ্যালিলি। ১৫৭৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর পুরো পরিবার ইতালীর ফ্লোরেন্স শহরে চলে আসেন। সেখানেই তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয়। ক্যামালডোলেজ নামক এক আশ্রমে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার হাতেখড়ি হয়। বাবার মতো তিনিও বেশ ভাল 'লিউট' (ষোড়শ শতকে ব্যবহৃত একপ্রকার তারের বাদ্যযন্ত্র) বাজাতে পারতেন। তবে তাঁর ভবিষ্যৎ পড়াশোনা নিয়ে এক ধোঁয়াশা তৈরি হয়। কারণ তাঁর বাবা প্রথমে ভেবেছিলেন ছেলেকে ক্যাথলিক চার্চের যাজক বানাবেন। কিন্তু পরে তিনি ছেলেকে ডাক্তারী পড়াবেন বলে মনস্থির করেন।

১৫৮৩ খ্রিস্টাব্দে গ্যালিলিও পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক্তারী পড়ার জন্য আসেন। প্রচন্ড মেধাবী গ্যালিলিও খুব দ্রুতই পিসার লেখাপড়া ভালো লাগতে শুরু করে। বিশেষ করে গণিত তাঁকে অধিক আকৃষ্ট করে। কোনো এক অধ্যাপকের গণিতের লেকচার তাঁকে এতোটাই আকৃষ্ট করে যে, তা তাঁর জীবন তথা বিজ্ঞানের গতিপথ বদলে দেয়।

হান্স লিপারসে নামে এক চশমা শিল্পী একটা নলের দুপাশে দুটো লেন্স লাগিয়ে দূরের জিনিসকে কাছে দেখার খেলনা তৈরি করেছেন শুনে তিনি নিজেই লেন্স এর ফোকাস দূরত্ব বিষয়ক অঙ্ক কষে টেলিস্কোপ বা দূরবীন বানান। গাণিতিক সূত্রের ভিত্তিতে লেন্স গঠন আর স্থাপনার প্রকৌশলে সেই দূরবীন হয়ে উঠল এক অসাধারণ বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম। সেই দূরবীন দিয়ে আকাশ দেখা তাঁকে পেয়ে বসল। তিনি দেখতেন গ্রহ-নক্ষত্রের চলন। দেখতেন আর সেই নিয়ে অঙ্ক কষতেন। সেই সময় একটা ধারণা চালু ছিল যে পৃথিবী স্থির আর সূর্য তার চারদিকে ঘুরছে। এর বিরুদ্ধে যুক্তি দিয়ে অনেক কথা বলা হলেও ধর্মের ধ্বজাধারীরা পৃথিবীর নিশ্চলতার পক্ষে ছিলেন বলে, অনেক জ্ঞানী ব্যক্তিও সব বুঝে শেষমেষ পৃথিবীকে দাঁড় করিয়ে, অন্য সকল গ্রহ-নক্ষত্রকে তার চার দিকে ছুটিয়ে মারতেন। চার্চের ভয়ে, আর পিঠের চামড়া বাঁচাবার দায়ে এ কাজ তাদের করতে হত।

বিশ্ববিদ্যালয় জীবনেই গ্যালিলিও অ্যারিস্টটলীয় জ্ঞানের সাথে পরিচিত হন যা প্রাথমিকভাবে তখনকার আর সবার মতো তিনিও ধ্রুব সত্য মনে করতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হবার অভিপ্রায়েই লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সমস্যা বাধে অন্য জায়গায়। আর্থিক অনটনের কারণে ১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী অর্জনের পূর্বেই তাকে প্রথাগত লেখাপড়ার ইতি টানতে হয়। তাছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে ডাক্তারী পড়ার থেকে গণিত আর

পদার্থবিদ্যা বেশি ভালো লেগেছিল। ডাক্তারি পড়া যে তাকে দিয়ে হবে না, তা তিনি ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দিলেও গ্যালিলিও তাঁর গণিত শিক্ষা চালিয়ে যান। তিনি এসময় তাঁর একটি গবেষণা 'দ্য লিটল ব্যাল্যান্স' প্রকাশ করেন, যার মধ্যে তিনি ছোট ছোট বস্তু পরিমাপের হাইড্রোস্ট্যাটিক নীতি বর্ণনা করেন। তার এই গবেষণা জনপ্রিয়তা পায় এবং তিনি পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগপত্র পান। এসময়ই তিনি তাঁর বিখ্যাত পড়ন্ত বস্তু নিয়ে গবেষনা শুরু করেন।

তিনি জানতেন যে, পেন্ডুলামের তারের এবং দোলনের সম্পর্ক গাণিতিক। এই বিষয়টি তার দুই হাজার বছর আগে পীথাগোরাস আবিষ্কার করেছিলেন!

তবে পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার সুসময় বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। কেননা গবেষণা করে তিনি যেসব তথ্য প্রকাশ করেন, অ্যারিস্টটলের সাথে তার তেমন কোনো মিল ছিল না। আর তিনি অ্যারিস্টটলের ধারণার সমালোচনা করেছিলেন। অথচ সেই সময়কার দার্শনিক, বিজ্ঞানী এবং জ্ঞানীগুণী সমাজ অ্যারিস্টটলের উপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখতেন। তাই তাঁরা গ্যালিলিওর বিরুদ্ধে চলে যান। এর ফলস্বরূপ ১৫৯২ খ্রিস্টাব্দে গ্যালিলিও পিসা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর শিক্ষকতার পদ হারান।

তাই বলে শিক্ষকতার পেশায় ফিরে আসতে বেশিদিন তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়নি। ১৫৯২ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইতালির বিখ্যাত পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন। সেখানে তিনি বলবিদ্যা, জ্যামিতি এবং জ্যোতির্বিদ্যা পড়াতেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়েই ১৮ বছর শিক্ষকতা করেন গ্যালিলিও। এখানে তিনি গবেষণা করার পর্যাপ্ত সুযোগ পান। ফলে বলা যায় এখানেই তাঁর সৃজনী শক্তির বিকাশ ঘটে। এসময়ে তিনি গবেষণা করেছেন, প্রচুর বইপত্র লিখেছেন, বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা দিয়েছেন এবং কিছু বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিও আবিষ্কার করেছেন। এর মধ্যে থার্মোমিটার উল্লেখযোগ্য। ১৫৯৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি পৃথকভাবে থার্মোমিটার আবিষ্কার করেন। যদিও ১৭১৪ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী ড্যানিয়েল গ্যাব্রিয়েল ফারেনহাইট প্রথম আদর্শ পারদ থার্মোমিটার আবিষ্কার করেন।

আগেই টেলিস্কোপ বা দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছিল। কিন্তু গ্যালিলিও এর আরো উন্নতি সাধন করেন এবং উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন দূরবীক্ষণ যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। নিজের তৈরি দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েই তিনি আকাশ পর্যবেক্ষণ শুরু করেন। আবিষ্কার করেন বৃহস্পতির চারটি উপগ্রহ। তিনি শুক্র গ্রহের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করেন এবং নিশ্চিত হন শুক্র একটি গ্রহ যা সূর্যের চারিদিকে আবর্তিত হয়। ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে আকাশ পর্যবেক্ষণের সকল তথ্য উপাত্ত নিয়ে তিনি রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত বই নক্ষত্র দূত (Starry Messenger)। এ বইয়ে তিনি এরিস্টটল ও টলেমির পৃথিবীকেন্দ্রীক মহাবিশ্বের মতবাদের সমালোচনা করেন। তিনি কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক মতবাদকে সমর্থন করেন এবং এর পক্ষে যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপন করেন। সৌরকলঙ্কের তিনিই প্রথম ধারণা দেন। ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রকাশ করেন সৌরকলঙ্ক সম্পর্কে পত্রাবলি শিরোনামে একটি বই।

গ্যালিলিওর সময়কাল ক্যাথলিক চার্চের পোপ এবং ধর্মযাজকগণ ছিলেন খুবই ক্ষমতাধর। তারা বাইবেলের নিজেদের দেওয়া ব্যাখ্যা দিয়ে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করতেন। বাইবেলের সাথে সাংঘর্ষিক এমন কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব তখন প্রকাশ করা নিষিদ্ধ ছিল। যদি কেউ করতো, তাহলে তাকে কঠোর শাস্তি এমনকি মৃত্যুদন্ডও দেওয়া হতো। এ বিড়ম্বনায় পড়তে হয় গ্যালিলিওকেও। ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'ডিসকোর্স অন বডিস ইন ওয়াটার' প্রকাশ করেন, যেখানে তিনি অ্যারিস্টটলের বস্তুর জলে ভাষার যুক্তি খন্ডন করেন।

এবছরই তিনি তার এক ছাত্রের কাছে একটি চিঠি লেখেন, যেখানে তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, বাইবেলের কথার সাথে কোপার্নিকাসের আবিষ্কারের মতবিরোধ নেই। বরং বাইবেলে যা বলা ছিল, তা ছিল পৃথিবীর প্রেক্ষাপটে। এ সম্পর্কে তার একটি বিখ্যাত উক্তি না জানালেই নয়। "ঈশ্বর আমাদেরকে অনুভূতি, যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু আমাদেরকে সেগুলির ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন, এমন কথা আমি মানি না।" দুর্ভাগ্যজনকভাবে চিঠিটি জনসমক্ষে প্রকাশ হয়ে যায়। চার্চ ১৬১৬ খ্রিস্টাব্দে কোপার্নিকাস তত্ত্বকে সরাসরি বাইবেল বিরোধী বলে ঘোষণা করে এবং গ্যালিলিওকে সেই তত্ত্বের সমর্থন করতে নিষেধ করে। পরে অবশ্য ১৬২০ খ্রিস্টাব্দে চার্চ কোপার্নিকাসের বই প্রকাশ করে, তবে সৌরকেন্দ্রিক তত্ত্বকে বাদ দিয়ে। সে যাই হোক, প্রাথমিকভাবে গ্যালিলিও সাত বছর কোনোরকম ঝুটঝামেলা এড়াতে চার্চের আদেশ পালন করেন। তিনি তার আর কোনো পর্যবেক্ষণ ১৬২৩ খ্রিস্টাব্দের আগে প্রকাশ করেননি।

গ্যালিলিও'র ক্যাথলিক চার্চের অনুসারী মাফিও বার্বেরিনি নামের এক বন্ধু ছিল, যিনি পরে পোপ 'আরবান VIII' নির্বাচিত হন। তিনি গ্যালিলিওকে তাঁর জোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গবেষণা চালিয়ে যাবার অনুমতি দেন তবে সেগুলোতে কোনোরকম কোপার্নিকাসের তত্ত্বের সমর্থন থাকবেনা এই শর্ত চাপিয়ে দেন।

১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে গ্যালিলিও তাঁর বিখ্যাত বই 'ডায়ালগ' প্রকাশ করেন। বইটি ছিল তিনজন ব্যক্তির কথোপকথনের উপর ভিত্তি করে, যেখানে একজন ব্যক্তি কোপার্নিকাসের সৌরকেন্দ্রীক তত্ত্বকে সমর্থন করে কথা বলছেন, অন্যজন সে যুক্তি খন্ডন করার চেষ্টা করছেন। তৃতীয় ব্যক্তি ছিলেন নিরপেক্ষ। বইটি প্রকাশের সাথে সাথে চার্চ এর প্রতিক্রিয়া দেখায় এবং গ্যালিলিওকে রোমে ডেকে পাঠায়।

১৬৩২ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর থেকে ১৬৩৩ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাস পর্যন্ত গ্যালিলিওর বিচার চলে। এ সময় গ্যালিলিওকে জেলে

যেতে হয়নি। জেরায় গ্যালিলিও প্রথমে স্বীকার করতে না চাইলেও শেষ পর্যন্ত তাঁকে শারীরিক নির্যাতনের হুমকি দিয়ে স্বীকার করানো হয় যে, তিনি ডায়ালগে কোপার্নিকাসের তত্ত্বকে সমর্থন করেছেন। তাঁকে ধর্মবিরোধিতার অভিযোগে অভিযুক্ত করে গৃহবন্দী করা হয় এবং দুটি আদেশ দেওয়া হয় – (ক) বাইরের কোনো মানুষের সাথে তিনি দেখা করতে পারবেন না, (খ) ইতালির বাইরে তার কোনো গবেষণা কাজ প্রকাশ করা যাবে না। বলা বাহুল্য তিনি একটিও পালন করেননি।

গৃহবন্দী থাকা অবস্থায় তাঁর 'ডায়লগে'র একটি কপি হল্যান্ডে ১৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এ সময় তিনি গতিবিজ্ঞানের ওপর তার সারাজীবনের কাজ নিয়ে 'টু নিউ সায়েন্সেস' বইটি লেখেন, যা হল্যান্ড থেকে ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ততদিনে গ্যালিলিও অন্ধ এবং গুরুতর অসুস্থ হয়ে জীবনের অন্তিমকালে চলে এসেছেন।

গৃহবন্দীর আট বছরের মাথায় ৭৭ বছর বয়সে ইতালীর ফ্লোরেন্সের নিকটে আর্সেট্রি নামক স্থানে ১৬৪২ খ্রিস্টাব্দের ৮ই জানুয়ারি মারা যান এই মহান বিজ্ঞানী।

যদিও তিনি মারা যাওয়া পর্যন্ত তার অধিকাংশ কাজের উপর চার্চের নিষেধাজ্ঞা ছিল, কিন্তু কালের পরিক্রমায় সত্য থেকে বিমুখ থাকতে পারে নি চার্চ। ১৭৫৮ খ্রিস্টাব্দে চার্চ তার অধিকাংশ কাজের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে চার্চ তার সকল কাজের উপর সকল ধরনের নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলে জয় হয় বিজ্ঞানেরই। যে তত্ত্ব প্রচারে জন্য গ্যালিলিওকে কারাভোগ করতে হয়েছিল, নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছিল, সেই তত্ত্ব আজ সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। একারণে গ্যালিলিওর বিচারের ৩৫৮ বছর পরে ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে ভ্যাটিকান পোপ জন পল দ্বিতীয় সেই দণ্ড ভুল ছিল বলে রায় দেন এবং ভুল রায় প্রদানের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। পোপের এই ভুল স্বীকার বিজ্ঞানের নিকট ধর্মীয় কুসংস্কারের পরাজয় ছাড়া আর কিছুই নয়। পরে অনেক পোপই তাঁর কাজের গুরুত্ব অনুধাবনের কথা বলেন এবং বিজ্ঞানে ও পৃথিবীকে আরও ভালোভাবে চেনার পথপ্রদর্শক হিসেবে তার কাজের স্বীকৃতি দান করেন।

আমরা আজ সবাই জানি পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষণ বিজ্ঞানের অন্যতম অনুষঙ্গ। যেকোনো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে গাণিতিক সত্যের মাপকাঠিতে প্রতিষ্ঠিত হতে হয়। গণিতের মাধ্যমে যে সত্য আবিস্কৃত হয়েছে, স্থান-কাল-পাত্র ভেদে তা মেনে নেওয়া সকলের জন্যই সহজ। গ্যালিলিও পরীক্ষণ ও গণিতের সমন্বয়ে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় প্রমাণে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখেন। গ্যালিলিও,র পূর্বে পর্যবেক্ষণই ছিল বৈজ্ঞানিক প্রমাণের একমাত্র হাতিয়ার। কিন্তু গ্যালিলিও কেবল পর্যবেক্ষণ নয় সেইসাথে পরীক্ষণকেও বৈজ্ঞানিক সূত্র উদ্ঘাটনের হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগান। মূলত তাঁর প্রবর্তিত এই বৈজ্ঞানিক নীতির জন্যই বিজ্ঞান আজ সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পেরেছে। তিনি বিজ্ঞানকে দর্শন ও ধর্ম থেকে আলাদা করেন। গণিতকে বৈজ্ঞানিক প্রমাণের মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে তিনিই প্রথম বস্তুর গতির গাণিতিক তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। তিনি গাণিতিকভাবে প্রকৃতির নিয়মাবলী সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করেন।

গ্যালিলিও পরীক্ষার মাধ্যমে দেখান যে উঁচু স্থান থেকে মুক্তভাবে নীচের দিকে পড়ন্ত বস্তু, ভারী এবং হালকা উভয়ই, একই গতিতে মাটিতে পড়ে। এরিস্টটলের প্রভাব এড়িয়ে সম্পূর্ণ নতুনভাবে ভিন্ন আঙ্গিকে গ্যালিলিও এ পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ করেন। ইতালির বিখ্যাত পিসা টাওয়ারের উপর থেকে হালকা ও ভারী দুটি বস্তুকে নিচের দিকে ফেলে তিনি তাঁর এই পরীক্ষা চালান। তাঁর পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞানকে গাণিতিক বিশ্লেষণের সাহায্যে প্রমাণ করেন এবং তাঁর বিখ্যাত বই 'ডিসকোর্স অন টু নিউ সায়েন্সেস' প্রকাশ করেন। যা আজও সবার কাছে সমাদৃত।

মধ্যযুগের অজ্ঞতার বিরুদ্ধে বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের তিনি ছিলেন অন্যতম পুরোধা। তিনি ছিলেন অসাধারণ মানবতাবাদী একজন মানুষ। তিনি মানুষকে এবং মানুষের শক্তিকে বিশ্বাস করতেন। স্বভাবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী। তিনি একবার বলেছিলেন, 'আমি এমন অজ্ঞ একজন মানুষও পাই নি, যার নিকট থেকে আমি কিছু শিখিনি।'

গ্যালিলিও মনে করতেন সত্য সব সময়েই সহজ যদি তা আবিষ্কার করা যায়। সত্যকে মেনে নিতে মধ্যযুগের মানুষের যেমন অনাগ্রহ ছিল, বর্তমান যুগেও এ অবস্থার খুব একটা উন্নতি হয়েছে এমনটি বলার কোন কারণ নেই। সত্য ও বিজ্ঞান এখনো ধর্মান্ধ, উগ্রপন্থীদের আক্রমণের স্বীকার। গ্যালিলিও সেই মধ্যযুগে যে সত্য আবিষ্কার করেছিলেন তা আজও সমান প্রাসঙ্গিক এবং এই কারণেই গ্যালিলিও গুরুত্বপূর্ণ।

গ্যালিলিও বলেছিলেন "জগতে যখন মূর্খের সংখ্যা বেড়ে যায় তখন সত্যের প্রকাশ দূরূহ হয়ে পড়ে"। সত্য প্রকাশের জন্য তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। আগেই বলেছি পরে অবশ্য তাঁকে হত্যা না করে অন্তরীণ করা হয়েছিল বাকি জীবনের জন্য। মূর্খের রাজ্যে সত্য প্রকাশ কতটা দুরূহ তা তিনি জীবনভর উপলব্ধি করেছেন। তিনি আজীবন সত্য প্রকাশের জন্য সংগ্রাম করেছেন। অন্ধবিশ্বাস নয় বিজ্ঞানকেই হাতিয়ার করেছেন। তাই আজ মুক্তমনা যুক্তিবাদী বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের হৃদয়ে তিনি বেঁচে আছেন। গ্যালিলিও সেই মহান বিজ্ঞানী যিনি সারাজীবন সত্যের সপক্ষে প্রাণ হাতের মুঠোয় করে মাথা তুলে দাঁড়াতে ভয় পান নি, দ্বিধা করেন নি। ■

ধারাবাহিক নিবন্ধ ঃ

মহাবিশ্বের অন্বেষণে মানুষ

– হরিরাম আহমেদ

[অষ্টম পর্ব (প্রথম অংশ)]

আমরা বিজ্ঞানী নিউটনের জীবনকাল পর্যন্ত বিগত পর্বগুলিতে মানুষের মহাবিশ্ব অন্বেষণ দেখেছি। সেখানে এটা পর্যবেক্ষণ করে পেয়েছি যে পার্থিব জগৎ এবং মহাকাশের সকল বস্তু গতিশীল। কিন্তু বস্তুর যে অবস্থা খালি চোখে বা অনুবীক্ষণ যন্ত্রেও পর্যবেক্ষণ সম্ভব নয়, সেই আনবিক স্তরে গতিশীলতা কেমন তখনো পর্যন্ত জানা ছিল না।

আমরা তৃতীয় পর্বের শেষাংশে বিজ্ঞানী রবার্ট বয়েলের তিনটি পরীক্ষার প্রসঙ্গে আলোচনা করেছিলাম। এর শেষেরটি ছিল আনবিক অথবা পারমাণবিক স্তরে বস্তু কণার গতি সম্পর্কিত ধারণা। বিজ্ঞানীদের মধ্যে তিনিই প্রথম এই ধারণার সত্যতা পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত করেছিলেন। তার আগে পর্যন্ত দার্শনিকদের কিছু অংশ এমন সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন। কিন্তু বক্তব্যের স্বপক্ষে যথেষ্ট পরিমাণ মালমশলার অভাবে, সেই বক্তব্যগুলি দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক মহলে সর্বজনীন গৃহীত হয়নি। বিজ্ঞানী বয়েলের এই পরীক্ষার পর বিভিন্ন প্রকার প্রাথমিক কণার মিলমিশ বা পৃথকীকরণ যে নতুন ধর্মের পদার্থ সৃষ্টি করে তা জানা যায়। একেই আধুনিক রসায়ন বিজ্ঞানের মূল কথা বলা হয়। পদার্থের অবস্থার পরিবর্তনের সময় (কঠিন-তরল-গ্যাস) বা চৌম্বক পদার্থের চুম্বকে পরিণত হওয়ার সময় বলা হয় এই পরিবর্তনটা অস্থায়ী। কিন্তু এই বিশেষ পরিবর্তিত অবস্থাকে আবার আগের অবস্থায় সহজে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। যেন এই পরিবর্তন স্থায়ী। এই পরিবর্তন সংক্রান্ত ধারণা আরো বিকশিত হয় তড়িৎ বিশ্লেষণ আবিষ্কারের পরে।

আমরা বিগত অধ্যায়গুলিতে এই বিশেষ বিভাগটির উপর আলোকপাত করিনি। তাই এই পর্বে তার অবতারণা। আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছিলাম যে বয়েল কিংবা নিউটনও আধুনিক রসায়ন বিজ্ঞানের ধারণা পোষণ করতেন না। তার কারণ পর্যালোচনার জন্য মানুষের দ্বারা রসায়ন বিজ্ঞান চর্চার প্রারম্ভ থেকে শুরু করা যাক।

প্রয়োগের দ্বারা রসায়ন শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ

মানব ইতিহাসে ব্যবহারিক জীবনে প্রথম রসায়ন শাস্ত্রের প্রয়োগ হয় আগুন আবিষ্কারের পর থেকে। সময়কালটা ১৪ লক্ষ বছর খ্রীঃ পূঃ। শুরু হল জীবজগতে প্রথম আগুনে পুড়িয়ে মাছ-মাংস ইত্যাদি খাওয়া। অজান্তেই মানুষের রসনায় রসায়ন চর্চা শুরু হল। কারণ পোড়া খাবারের রাসায়নিক পরিবর্তন হয়ে গেছে। খাবার তৈরির জন্য পোড়া মাটির পাত্র, চিনামাটি, কাঁচ আবিষ্কার হল একে একে। যদিও এগুলোর আবিষ্কার হয়েছে আগুন আবিষ্কারের অনেক পরে। যেমন মাটির পাত্রের ব্যবহার শুরুর প্রাচীনতম নমুনা পাওয়া যায় জাপানে ১৩ হাজার বছর খ্রীঃ পূর্বাব্দে। আদিম মানুষের বিকাশের এই পর্যায়টা ছিল আজকের সাপেক্ষে অতি ধীর। যদিও আগুন আবিষ্কার মানব সমাজের প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের বিকাশকে পূর্বের সাপেক্ষে অনেক গতিশীল করেছিল।

৮০০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে আজকের প্যালেস্টাইনে প্রথম কৃষিকাজের নিদর্শন পাওয়া যায়। তখনও প্রস্তর যুগ চলছে। এই সময়কাল পর্যন্ত মানুষ খনন কার্য শিখেছে, মাছ ধরার হুক, বর্শা, তীর-ধনুক বানাতে শিখে গেছে। ৭৫০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে গম, বার্লি উৎপাদনের পাশাপাশি বিভিন্ন মশলার চাষ করেছে। এর ফলে সুস্বাদু রান্না সম্ভব হয়েছে। রসনায় স্বাদ ও ঘ্রাণে সুগন্ধ আনতে অজান্তে মানুষ রসায়ন চর্চা করেছে।

তামা ধাতু ও তার সঙ্গে সঙ্গে সোনার আবিষ্কার হয় ৬৫০০ খ্রিঃ পূর্বাব্দে। মিশর ও পারস্যে প্রথম তামার ব্যবহারের নমুনা পাওয়া গেছে। এভাবে প্রস্তর যুগের স্থলাভিশিক্ত হয়েছে তাম্রযুগ। তামাই প্রথম আবিস্কৃত ধাতু হওয়ার কারণ এটি খনন কার্য ছাড়াই প্রায় অটুট অবস্থায়ই পাওয়া গেছিল (অন্যান্য ধাতু যৌগ হিসেবে প্রকৃতিতে পাওয়া যায়)। এছাড়া এই আকরিক থেকে তামা নিষ্কাশনে যে পরিমাণ তাপশক্তির প্রয়োজন, তারজন্য জঙ্গলের কাঠ দহনই যথেষ্ট। এই আকরিক থেকে তামা নিষ্কাশনও মানুষের অজান্তে রসায়ন শাস্ত্রের চর্চা। তামা ও সোনা – উভয় ধাতুই নমনীয় (malleable)। তাই যেকোনো আকার-আকৃতির অস্ত্র ও অন্যান্য ব্যবহারিক সরঞ্জাম বানানো খুব সহজ হল, যা প্রস্তর যুগে সম্ভব ছিল না। মানব সমাজ উল্লম্ফনের মাধ্যমে এগিয়ে চলল। ৫০০০ খ্রিঃ পূর্বাব্দে পশু চামড়া ট্যান করা থেকে শুরু করে ৪০০০ খ্রিঃ পূর্বাব্দে বার্লি পচিয়ে মদ তৈরি, টিন ধাতু আবিষ্কারের পর ৩৩০০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে তামা ও টিনের সংকরায়ন ঘটিয়ে ব্রোঞ্জ – সবই ছিল অজ্ঞাতসারে রসায়ন বিদ্যার চর্চা।

২০০০ খ্রিঃ পূর্বাব্দে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় লোহার আকরিক যৌগ থেকে লোহা নিষ্কাষন সম্ভব হল। একটি রুশ পুস্তক 'রাসায়নিক মৌল – কেমন করে সেগুলি আবিষ্কৃত হয়েছিল'-তে অবশ্য লেখা আছে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে লোহা আবিষ্কৃত হয়েছিল। এই প্রক্রিয়ায় প্রচুর তাপশক্তি ও অক্সিজেনের প্রয়োজন। খনন প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত চারকোল দ্বারা ও হাপরের উদ্ভাবনের ফলে দহনকালীন অক্সিজেন সরবরাহ করে এই কাজ সম্পন্ন হয়। তামা ধাতু নিষ্কাশন ও লোহা নিষ্কাশনের তুলনামূলক ছবি দুটি দেখলেই বোঝা যাবে কেন মানুষের

পক্ষে লোহা আবিষ্কার পূর্বে সম্ভব ছিল না। এরপর কাঁচা লোহা (wrought iron) এর সঙ্গে চারকোলের কার্বন মিশ্রিত হয়ে ইস্পাত তৈরি করলো মানুষ যা ব্রোঞ্জের থেকেও দৃঢ়। ১৫০০ খ্রিঃ পূর্বাব্দে তামা ও জিঙ্ক মিশ্রিত হয়ে পিতল তৈরি হল।

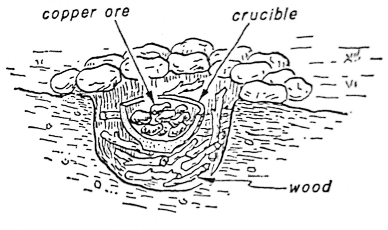

(a)

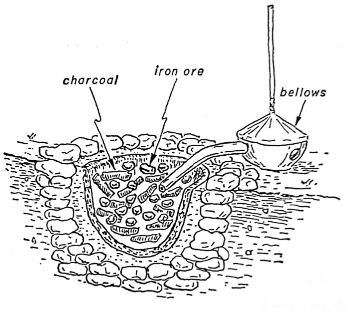

(b)

প্রাগৈতিহাসিক যুগের ইতিহাস সংগ্রহ করতে হয় প্রত্নতাত্ত্বিক নমুনা থেকে। তাই এই প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত নমুনা থেকে মানুষের রসায়ন শাস্ত্রের চর্চার একটা স্পষ্ট ছবি পাওয়া যায় না। প্রাপ্ত নমুনা থেকে একটা আবছা ধারণা করা সম্ভব।

রাসায়নিক পরিবর্তনগুলো মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে তার বৈশয়িক জীবনের পরিবর্তিত অবস্থার মধ্যে থেকে। পার্থিব জগতের বস্তু সকলের অবস্থান পরিবর্তন বা মহাকাশের গ্রহ-উপগ্রহ-নক্ষত্রদের চলন সাদা চোখে প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু অবস্থা পরিবর্তনের সময় কোনো বস্তুর অণুগুলির গতি বা চৌম্বক পদার্থের অণুগুলির নতুন সজ্জাবিন্যাসের কারণে তার চৌম্বকত্ব প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বস্তুর অণুর স্থান পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়। তেমনি রাসায়নিক পরিবর্তন হল প্রকৃতির বস্তুগুলির মৌলিক অদল বদল। এই ঘটনাও মানুষের চোখ দিয়ে দেখা সম্ভব নয়। অথচ এই আনবিক স্তরে বা পারমাণবিক স্তরে বস্তুকণার স্থান পরিবর্তনের ফলশ্রুতিতে যে পরিবর্তিত অবস্থা তৈরি হচ্ছে সেটা বোঝা সম্ভব। শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান থেকে এই ঘটনাগুলি কিভাবে ঘটবে বোঝা সম্ভব নয়। এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান থেকে যে ধারণাগুলি মানব মনে এসেছিল তার সম্পর্কে এবার আসা যাক।

রাসায়নিক পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কিত ধারণার সূত্রপাত

গ্রিক দার্শনিক থালেসকে স্মরণ করুন (পঞ্চম পর্ব দ্রষ্টব্য)। তিনি যেমন পিরামিডের উচ্চতা নির্ণয় করেছিলেন, তেমনি গণিতের ক্ষেত্রে সেযুগে অনন্য ভূমিকা রেখেছিলেন, তেমনি পদার্থের মৌলিক রূপ কি হতে পারে সে বিষয় নিজস্ব চিন্তা রাখেন। তাঁর মনে প্রশ্ন এসেছিল ঃ যদি একটি পদার্থকে অন্য পদার্থে রূপান্তরিত করা যায়, যেমন নীলাভ পাথরকে তামায়, তাহলে পদার্থের প্রকৃতরূপটা আসলে কি? এটা কি পাথর, নাকি তামা বা এরা উভয়ই সম্পূর্ণ অন্য বস্তু? একটি পদার্থকে কি অন্য পদার্থে রূপান্তরিত করা সম্ভব? – দার্শনিক থালেসের মনের এই প্রশ্নগুলি ছিল এতকালের বৈশয়িক জীবনে রাসায়নিক পরিবর্তন দেখে মানব মনের প্রশ্নাবলী। মৌলিক পদার্থ কী, এই খোঁজ তখন থেকেই শুরু হয়।

তাঁর ধারণায় মৌলিক পদার্থ হল জল। কেননা জল রয়েছে সমতল এই পৃথিবীর চারিপাশে। বায়ুমন্ডলও জলীয় বাষ্প দিয়ে তৈরি, মাটি খুঁড়লে পাওয়া যায় জল (অর্থাৎ মাটিও জল থেকে তৈরি)। তাঁর ধারণায় সমতল চাকতি আকৃতির পৃথিবীর উপর রয়েছে অর্ধগোলাকার আকাশ। এই পৃথিবী অসীম সমুদ্রে ভাসমান। মোটামুটি ৬০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে মানব ধারণায় যেমন জল ও পৃথিবী ছিল মৌলিক পদার্থ তেমনি ৫৭০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে বাতাসকে মৌলিক পদার্থ হিসেবে বিবেচনা করা হত। গ্রিক দার্শনিক হেরাক্লিটাস (৫৪০ খ্রীঃ পূর্ব – ৪৭৫ খ্রীঃ পূর্ব) বলেন পৃথিবী, জল, বাতাস ছাড়াও আগুন হল চতুর্থ মৌলিক পদার্থ। গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের ধারণায় বায়ুমন্ডলের বহিঃস্থ গ্রহ-উপগ্রহ-তারা (এককথায় স্বর্গীয় বস্তুসকল) গড়ে উঠেছে ইথার নামক এক কাল্পনিক মৌল দ্বারা। ইথারেই নিমজ্জিত এই সকল স্বর্গীয় বস্তু। এই ধারণা আরো দুহাজার বছর টিকে ছিল। পরবর্তীকালের কিমিয়াবিদরা অ্যারিস্টটলের এই ভূকেন্দ্রীর বিশ্বের মডেলকে মেনেছে দুহাজার বছর। এই মডেলের চিত্র দেওয়া হল।

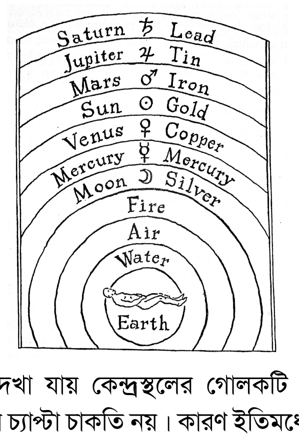

এই চিত্রে দেখা যায় কেন্দ্রস্থলের গোলকটি পৃথিবী (এটি থালেসের ধারণার চ্যাপ্টা চাকতি নয়। কারণ ইতিমধ্যে অ্যারিস্টটল গোলকাকৃতির পৃথিবীর ধারণা দিয়েছেন। একে ঘিরে ক্রমান্বয়ে আছে জল, বাতাস, আগুন, চাঁদ (যা রূপাধাতুর তুলনীয়), মারকারি

(যা পারদ ধাতুর তুলনীয়), ভেনাস (যা তামা ধাতুর তুলনীয়), সূর্য (যা সোনা ধাতুর তুলনীয়), মার্স (যা লোহা ধাতুর তুলনীয়), জুপিটার (যা টিন ধাতুর তুলনীয়) এবং স্যাটার্ন (যা সিসা ধাতুর তুলনীয়)। এখানে একদিকে মহাকাশে অবস্থিত খালি চোখে দেখা গ্রহ-নক্ষত্র বা গ্রহের উপগ্রহগুলিকে তখনো পর্যন্ত আবিস্কৃত ধাতুগুলির সমার্থক ধরা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই সেগুলির বাহ্যিক চেহারার সঙ্গে ধাতুগুলির বাহ্যিক চেহারার সাদৃশ্য থেকেই এমনটা করা হয়েছে। মানুষের আবিস্কৃত ধাতুগুলির বৈশয়িক জীবনে যে তাৎপর্য রয়েছে, তার থেকেই তাদের গুরুত্ব এতটাই হয় যে তাদের স্বর্গীয় বস্তুগুলির সঙ্গে তুলনা করা চালু হয়। এছাড়াও অন্ধকার আকাশে নক্ষত্রপুঞ্জকে কাল্পনিক রেখায় জুড়ে যে বাস্তবিক জীবনের বিভিন্ন বস্তুর কল্পনা মানুষ শুরু করে, তা থেকেই এসেছে ১২টা রাশির ধারণা। রাশিগুলির নামকরণ (যেমন তুলা বা দাড়িপাল্লা, মেষ, বৃশ, কন্যা, মৎস ইত্যাদি) করা যেত না, যদিনা প্রাত্যহিক জীবনে তাদের প্রয়োজনীয়তা-গুরুত্ব-উপস্থিতি থাকতো। তাই বলা যায় রাশিগুলির ধারণাও এসেছে বস্তু থেকে। মানব মনে এই রাশির ধারণার সূত্রপাত হয় ব্যাবিলনের সভ্যতা থেকে (৪৫০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে)। রাশিগুলির সঙ্গে ধারণা করা হয় মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গের কার্যকারীতাকে। সেই থেকে রাশিফল গণনা চর্চার সূত্রপাত হয়। দেহের বিভিন্ন অংশের গোলোযোগ সমাধানে এক একটি রাশি যেহেতু দায়ী বলে ধারণা করা হত, তার প্রতিকারে কিমিয়াবিদদের উল্লিখিত মডেলের ধাতুগুলি ধারণ প্রচলন শুরু হয়। এক কথায় ধাতুগুলির মানব জীবনে অতিগুরুত্বলাভের পাশাপাশি মহাকাশ সম্পর্কে অজ্ঞতা ও ভয় এই অলৌকিক বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে। এই অজ্ঞতা সমগ্র মানব সমাজের অজ্ঞতা, কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নয়।

রাসায়নিক পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক ধারণার স্বপক্ষে দার্শনিকদের যুক্তি

বৈজ্ঞানিক ধারণার সুত্রপাত না হওয়া পর্যন্ত অলৌকিক ধারণা থাকলেও কতগুলি মৌলিক প্রশ্ন ইতিমধ্যে উঠে এসেছে। অর্থাৎ মৌলিক পদার্থ কী? বিদ্যমান বিশ্বের সকল পদার্থ যদি এই মৌলগুলি দিয়ে গঠিত, তবে উপস্থিত বস্তুসকলের স্থায়ী রূপান্তর ঘটানো কি সম্ভব? –

এমন সব প্রশ্ন থেকেই অবধারিতভাবে এসেছে অন্য ধাতুকে সোনায় পরিণত করার প্রসঙ্গটি। আধুনিক রসায়ন বিজ্ঞান থেকে দেখলে হাস্যকর মনে হলেও তৎকালীন সময়ের সাপেক্ষে বিষয়টিকে বিচার করা দরকার। যেমন মৌলিক পদার্থের ধারণায় 'পৃথিবী-জল-বাতাস-আগুন'-কে আজকের সাপেক্ষে কঠিন-তরল-গ্যাস-শক্তি বা বস্তুর ভর ও শক্তি – এমন ধারণায় আসা যায়। অর্থাৎ সেই সময়কার বেঠিক ধারণার মধ্যে লুকিয়ে ছিল ভবিষ্যতের সঠিক ধারণা।

পদার্থের মৌলিক রূপ কেমন, সে সম্পর্কে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ধারণার স্বপক্ষে কয়েকজন দার্শনিক অভিমত প্রকাশ করলেও ইউরোপে অ্যারিস্টটলের পরিমন্ডলের বিরুদ্ধতার কারণে এবং এই নতুন ধারণার স্বপক্ষে যথেষ্ট মালমশলার অভাব থাকায় আধুনিক বৈজ্ঞানিক ধারণার স্বপক্ষের দার্শনিকদের অভিমত টেকেনি। ৪৫০ খ্রিঃ পূর্বাব্দে আয়োনিয়ান লিউকিপ্পাস ও তাঁর শিস্য ডেমোক্রিটাস বলেন যে পদার্থের ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য কণা হল অ্যাটম, অর্থাৎ পরমাণু (অ্যাটম কথার অর্থ ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য কণা)। ডেমোক্রিটাসের মতে আমরা যে বাস্তব পদার্থগুলিকে দেখি, তা হল বিভিন্ন পরমাণুর মিশ্রণ। বিভিন্ন এই পরমাণুগুলি আবার পরস্পর আকার আকৃতিতে স্বতন্ত্র। তিনি বলেন এক পদার্থ অন্য পদার্থে রূপান্তরিত হয় (যাকে আমরা রাসায়নিক পরিবর্তন বলছি) এই মিশ্রণের অদল-বদল দ্বারা। পরবর্তীকালে দার্শনিক এপিকিউরাস এই পারমাণবিক তত্বকে তাঁর দর্শনে অন্তর্ভুক্ত করেন। ইউরোপের দার্শনিকদের ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য কণার ধারণার মত ৬০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে ভারতের দার্শনিক কনাদও এমনই মতামত প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রেও ধারণার স্বপক্ষে বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অভাব ছিল। ফলে এক্ষেত্রেও পরামণুবাদ দার্শনিক ধারণার স্তর অতিক্রম করতে পারে নি।

ডেমোক্রিটাসের ও অন্যান্য সমমতালম্বী দার্শনিকদের ধারণার বিকৃতি সাধন

অ্যারিস্টটলের সময়কালে আলেকজান্ডার পারস্য আক্রমণ করেন। আলেকজান্ডারের সেনাপ্রধান টলেমি মিশরে রাজত্ব স্থাপন করে একটি নগর প্রতিষ্ঠা করেন যার নাম আলেকজান্দ্রিয়া, যার অর্থ আলেকজান্ডার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। টলেমী ও তাঁর পুত্র দ্বিতীয় টলেমী এখানে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। যাকে বলা হয় মিউজিয়াম বা যাদুঘর। নামকরণেই বোঝা যায় যে এখানকার কাজকর্ম সম্পর্কে সকলের ধারণা কি ছিল। এই যাদুঘরটি ছিল রসায়ন গবেষণাকেন্দ্র এবং বিশ্ববিদ্যালয় তুল্য। এখানে গ্রন্থাগারও ছিল। এখানেই গ্রিকদের অ্যারিস্টটলীয় তত্ব এবং মিশরীয়দের এতকালের প্রায়োগিক রসায়নের ফিউশন তৈরি হয়। তামা ধাতুর আবিষ্কার থেকে শুরু করে পিরামিডের মমি সংরক্ষণ পর্যন্ত মিশর ছিল প্রায়োগিক রসায়নের উৎকৃষ্টতম স্থান। প্রয়োগের সঙ্গে তত্বের এই সম্মিলন হলেও তাতে দার্শনিকদের পরমাণুবাদ স্থান পায় নি। পারস্যের খেমেইয়া (Khemeia) শব্দের থেকে বর্তমানের কেমিষ্ট্রি শব্দ এসেছে বলে এক অংশের ধারণা। আবার অনেকের ধারণায় মিশরের খাম (Kham) শব্দ বা গ্রিক খুমস (Khumos) থেকে এই শব্দটি এসেছে। অর্থাৎ নামকরণ থেকেও বোঝা যায় আরবের ও গ্রিসের দার্শনিক ও প্রয়োগবিদের সমন্বয়ে এই বিশেষ

বিদ্যার চর্চা হয়েছে।

কিমিয়াবিদদের সম্পর্কে সাধারণে ধারণা ছিল এই যে এঁরা গুপ্তবিদ্যা-তন্ত্র-মন্ত্র জানে। এরাই কোপার্নিকাসের আগে ভূ-কেন্দ্রীক বিশ্বের মডেলের প্রচারক ছিল, যে মডেল চিত্রটি পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। তার ছায়া আজো রসায়ন বিজ্ঞানে রয়ে গেছে। যেমন সিলভার নাইট্রেট কে এখনো লুনার কস্টিক বলা চালু আছে, যেখানে রূপা ধাতুকে চাঁদ (ভূকেন্দ্রীক বিশ্ব মডেলের স্বর্গীয় বস্তু)-এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয়।

এতদিন পর্যন্ত ডেমোক্রিটাস-এপিকিউরাসদের পরমাণু তত্ত্ব ও কিমিয়াবিদদের টলেমী মডেল স্বতন্ত্রভাবে ছিল। কিন্তু ২০০ খ্রিঃ পূর্বাব্দে নীলনদের ব-দ্বীপ মেনডেসের এক রসায়নবিদ, নাম বোলস (Bolos) পুরানো 'চারটি মৌলিক পদার্থ নিয়ে গড়া এই বিশ্ব' – তত্ত্বকেই ডেমোক্রিটাসের নামে চালানো শুরু করেন। নিজেকে ডেমোক্রিটাসের অনুগামী বললেও বাস্তবে প্রচার করেন প্রকৃতি হল চারটি মৌলিক পদার্থের মিশ্রণ। তাই এক পদার্থকে অন্য পদার্থে রূপান্তরিত করা সম্ভব। এই ধারণা থেকেই অন্য পদার্থ থেকে সোনা তৈরি সম্ভব এই ধারণা হল।

কিমিয়াবিদদের উপর আক্রমণ

খেমেইয়া বলে পরিচিত বিষয়, অর্থাৎ রসায়নবিদ্যার চর্চাকারীদের উপর আক্রমণের সূত্রপাত হয় রাষ্ট্রের এই ভয় থেকে যে এরা যদি সোনা তৈরি করে ফেলে, তবে বিদ্যমান অর্থনীতির উপর রাষ্ট্রের কতৃত্ব থাকবে না। এদেরকেই আমরা কিমিয়াবিদ বলে উল্লেখ করেছি। রোমান সম্রাট ডাওক্লিটিয়ান (Diocletian) এর নির্দেশে কিমিয়াবিদদের সমস্ত লেখাপত্র নষ্ট করে দেওয়া হতে থাকে। এরপর ৪০০ খ্রিস্টাব্দে আলেকজেন্দ্রিয়ার মিউজিয়াম ধ্বংস করা হয় খ্রিস্টানদের দ্বারা। এই আক্রমণের ফলশ্রুতিতে খ্রিস্টানদেরই একটা অংশ, যাদের নেস্টোরিয়ান বলা হত, এরা পারস্যে চলে যান। তারাই খেমেইয়া লেখাপত্র, বই নিয়ে গেছিলেন পারস্যে। পারস্যে এসে খেমেইয়া (Khemeia) পরিচিতি লাভ করে আল-কিমিয়া (al-Kimiya) বলে।

এমনই একজন আল কেমিস্ট হলেন জাবির ইবন হায়াজ। ইনি বিভিন্ন রাসায়নিক যৌগ যেমন অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড, হোয়াইট লেড, ভিনিগারের পাতন প্রক্রিয়ায় অ্যাসেটিক অ্যাসিড উৎপাদন, দুর্বল নাইট্রিক অ্যাসিড প্রস্তুতি ছাড়াও এক ধাতুকে অন্য ধাতুতে রূপান্তরিত করা (Transmutation) নিয়েও নিজস্ব ধারণা ব্যক্ত করেন। তিনি মনে করতেন পারদ বা গন্ধক বিশেষ অনুপাতে মেশালে সোনা তৈরী সম্ভব। এই অ্যালকেমিস্টের মতো আরো একজনের নাম ইতিহাসে পাওয়া যায়, তিনি হলেন আল রাজি (Al-Raji) – যিনি প্লাস্টার অফ প্যারিস, ওষুধ তৈরিতে মন দেন।

ইউরোপীয়দের দ্বারা আলকেমিদের বইপত্র নিজস্ব ভাষায় অনুবাদ ও চর্চা

প্রথম ধর্মযুদ্ধ বা ক্রুসেডের পর (১০৯৬ খ্রিস্টাব্দ) ইউরোপের খ্রিস্টানরা আরব সম্পর্কে জানা শুরু করে। ১১৪০ খ্রিস্টাব্দের পর ইংরেজ শিক্ষাবিদ রবার্ট চেস্টার আরবের অ্যালকেমিস্টদের বইপত্র লাটিন ভাষায় অনুবাদ শুরু করেন। আরব থেকে ইউরোপে গণিত বিজ্ঞানের প্রসার যখন হচ্ছে, সেই সময় রসায়নবিদ্যার ক্ষেত্রেও ইউরোপীয়রা নতুন করে জানতে শুরু করে। এখান থেকে রসায়নবিদ্যার ইতিহাস চর্চা শুরু করলে এই বিজ্ঞানের শাখার বিকাশের জটিলতা অনুধাবন করা সম্ভব নয়। আমরা তাই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ক্রমান্বয়ে এই আলোচনায় অবতরণ করেছি।

যাই হোক আরবি অ্যালকেমিস্টদের থেকে ইউরোপীয় অ্যালকেমিস্টদের জন্মের এই হল সংক্ষিপ্ত রূপরেখা। এমনই দুজন বিখ্যাত লোক হলেন আলকর্টাস ম্যাগনাস ও রজার বেকন। ১৩০০ খ্রিস্টাব্দের প্রারম্ভ পর্যন্ত বিভিন্ন খনিজ পদার্থ থেকে তীব্র অ্যাসিড তৈরি আবিস্কৃত হয়। পূর্ব ধারণা ছিল যে কেবলমাত্র জৈব পদার্থ থেকেই অ্যাসিড তৈরি সম্ভব। সেই ধারণার ইতি ঘটে।

পুনরায় অ্যালকেমিস্টদের উপর আক্রমণ

এবারের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হন ইউরোপীয় অ্যালকেমিস্টরাও। ১৩১৭ খ্রিস্টাব্দে পোপ জন দ্বাদশ (XII) অ্যালকেমিস্টদের নিষিদ্ধ করেন এই ভেবে যে এরা সোনা তৈরি করে ফেলতে পারে। অ্যালকেমিস্টরা এই সময় আবার অন্তরালে চলে যান।

জার্মান প্রযুক্তিবিদ জোহান গুটেনবার্গ দ্বারা ছাপাখানার উদ্ভাবন সকল জ্ঞানের প্রসারকে ত্বরান্বিত করেছিল। কম খরচে বিপুল সংখ্যক বই এর কপি তৈরি করা এবার সহজ হল। অ্যালকেমিস্টরা যে কারণে অন্তরালে চলে গেছিলেন, পদার্থ বিজ্ঞানের নব চিন্ত করা সে কারণে দমিত হন নি। ভূকেন্দ্রীক বিশ্বের ধারণার বিপরীতে সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বের ধারণাকে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্র দমন করেছিল। এই ইতিহাস আমরা আগে উল্লেখ করেছি। তবু বর্তমান বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে জ্যোর্তিবিজ্ঞানী নিকোলাস কোপার্নিকাসের যুগান্তকারী আত্মপ্রকাশের প্রসঙ্গটিতে আবার আসছি। আরেকটি বিখ্যাত বই ফ্লেমিশ শারীরতত্ত্ববিদ অ্যানড্রিয়াস ভেসালিয়াসের মানব দেহ কঙ্কালের নিখুঁত বিবরণ সমৃদ্ধ বইটি ছেপে প্রকাশিত হল। গুনেটবার্গের প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের সঙ্গে এই দুটি বই-এর প্রকাশ যেমন একটা বিষয়, তেমনি এই দুটি বই-ই কিন্তু রসায়ন বিজ্ঞানের গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে।

এর মধ্যে কোপার্নিকাসের সূর্য কেন্দ্রিক বিশ্ব মডেল আর পুরানো চার মৌলিক পদার্থের তত্ত্বকে আমল দিল না। নতুন করে পদার্থের প্রাথমিক কণার সন্ধানে দার্শনিকদের ভাবনাকে উস্কে দিল। রসায়ন বিজ্ঞান ছাড়াও গ্রহ-নক্ষত্রের মানব জীবনে প্রভাব আছে কি নেই – তা নিয়েও প্রশ্ন উঠে গেল। (ক্রমশ)

চয়ন ঃ

অপবিজ্ঞান

– রাজশেখর বসু

বিজ্ঞানচর্চার প্রসারের ফলে প্রাচীন অন্ধসংস্কার ক্রমশ দূর হইতেছে। কিন্তু যাহা যাইতেছে তাহার স্থানে নূতন জঞ্জাল কিছু কিছু জমিতেছে। ধর্মের বুলি লইয়া যেমন অপধর্ম সৃষ্ট হয়, তেমনি বিজ্ঞানের বুলি লইয়া অপবিজ্ঞান গড়িয়া উঠে। সকল দেশেই বিজ্ঞানের নামে অনেক নূতন ভ্রান্তি সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক ছদ্মবেশে যেসব ভ্রান্ত ধারণা এদেশে লোকপ্রিয় হইয়াছে, তাহারই কয়েকটির কথা বলিতেছি।

প্রথমেই উল্লেখযোগ্য-বিদ্যুৎ। তীব্র উপহাসের ফলে এই শব্দটির প্রয়োগে আজকাল কিঞ্চিৎ সংযম আসিয়াছে। টিকিতে বিদ্যুৎ, পইতায় বিদ্যুৎ গঙ্গাজলে বিদ্যুৎ – এখন বড় একটা শোনা যায় না। গল্প শুনিয়াছি, এক সভায় পন্ডি শশধর তর্কচূড়ামণি অগস্ত্যমুনির সমুদ্র শোষণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। অগস্ত্যের ক্রুদ্ধ চক্ষু হইতে এমন প্রচন্ড বিদ্যুৎস্রোত নির্গত হইল যে সমস্ত সমুদ্রের জল এক নিমেষে বিশ্লিষ্ট হইয়া হাইড্রোজেন অক্সিজেন রূপে উরিয়া গেল। সকলে অবাক হইয়া এই ব্যাখ্যা শুনিল, কেবল একজন ধৃষ্ট শ্রোতা বলিল – 'আরে না মশায়, আপনি জানেন না, চোঁ করে মেলে দিয়েছিল'।

বিদ্যুতের মহিমা কমিলেও একেবারে লোপ পায় নাই। কিছুদিন পূর্বে কোনও মাসিক পত্রিকায় এক কবিরাজ মহাশয় লিখিয়াছিলেন – 'সর্বদাই মনে রাখিবেন তুলসীগাছের সর্বত্র নিরন্তর বৈদ্যুতিক প্রবাহ সঞ্চারিত হইতেছে।' এই অপূর্ব তথ্যটি তিনি কোথায় পাইলেন, চরকে কি সুশ্রুতে কিংবা নিজ মনের অন্তস্থলে, তাহা বলেন নাই। বৈদ্যুতিক সালসা বৈদ্যুতিক আংটি বাজারে সুপ্রচলিত। অষ্টধাতুর মাদুলির গুণ এখন আর শাস্ত্র বা প্রবাদের উপর নির্ভর করে না। ব্যাটারিতে দুই রকম ধাতু থাকে বলিয়া বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, অতএব অষ্টধাতুর উপযোগিতা আরও বেশি না হইবে কেন! বিলাতী খবরে কাগজেও বৈদ্যুতিক কোমরবন্ধের বিজ্ঞান মায় প্রসংশাপত্র বাহির হইতেছে। সাহেবরা ঠকাইবার বা ঠকিবার পাত্র নয়, অতএব তোমার আমার অশ্রদ্ধার কোনও হেতু নাই। মোট কথা, সাধারণের বিশ্বাস – মিছরি নিম এবং ভাইটামিনের তুল্য বিদ্যুৎ একটি উৎকৃষ্ট পথ্য, যেমন করিয়া হউক দেহে সঞ্চারিত করিলেই উপকার। বিদ্যুৎ কি করিয়া উৎপন্ন হয়, তাহার প্রকার ও মাত্রা আছে কিনা, কোন রোগে কি রকমে প্রয়োগ করিতে হয়, এত কথা কেহ ভাবে না। আমার পরিচিত এক মালীর হাতে বাত হইয়াছিল। কে তাহাকে বলিয়াছিল বিজলীতে বাত সারে এবং টেলিগ্রাফের তারে বিজলী আছে। মালী এক টুকরা ঐ তার সংগ্রহ করিয়া হাতে তাগা পরিয়াছিল।

উত্তর দিকে মাথা রাখিয়া শুইতে নাই, শাস্ত্রে বারণ আছে। শাস্ত্র কারণ নির্দেশ করে না। সুতরাং বিজ্ঞানকে সাক্ষী মানা হইয়াছে। পৃথিবী একটি প্রকান্ড চুম্বক, মানুষের দেহও নাকি চুম্বকধর্মী – অতএব উত্তরমেরুর দিকে মাথা না রাখাই যুক্তিসিদ্ধ। কিন্তু দক্ষিণমেরু নিরাপদ কেন হইল তাহার কারণ কেহ দেন নাই।

জোনাকিপোকা প্রদীপে পুড়িলে যে ধূয়া বাহির হয় তাহা অত্যন্ত বিষ এই প্রবাদ বহুপ্রচলিত। অপবিজ্ঞান বলে – জোনাকি হইতে আলোক বাহির হয় অতএব তাহাতে প্রচুর ফসফরাস আছে, এবং ফসফরাসের ধূয়া মারাত্মক বিষ। প্রকৃত কথা – ফসফরাস যখন মৌলিক অবস্থায় থাকে তখন বায়ুর স্পর্শে তাহা হইতে আলোক বাহির হয়, এবং ফসফরাস বিষও বটে। কিন্তু জোনাকির আলোক ফসফরাস-জনিত নয়। প্রাণিদেহ মাত্রেই কিঞ্চিৎ ফসফরাস আছে, কিন্তু তাহা যৌগিক অবস্থায় আছে, এবং তাঁহাতে বিষধর্ম নাই। এক টুকরা মাছে যত ফসফরাস আছে, একটি জোনাকিতে তাহার অপেক্ষা অনেক কম আছে। মাছ-পোড়া যেমন নিরাপদ, জোনাকি-পোড়াও তেমন।

কোনও কোনও বৈজ্ঞানিক নামের একটা মোহিনী শক্তি আছে, লোকে সেই নাম শিখিলে স্থানে অস্থানে প্রয়োগ করে। 'গাটোপার্চা এইরকম একটি মুখরোচক শব্দ। ফাউন্টেন পেন চিরুনি চশমার ফ্রেম প্রভৃতি বহু বস্তুর উপাদানকে লোকে নির্বিচারে গোটোপার্চা বলে। গোটোপার্চ রবারের ন্যায় বৃক্ষবিশেষের নিষ্যন্দি। ইহাতে বৈদ্যুতিক তারের আবরণ হয়, জলরোধক বার্নিশ হয়, ডাক্তারি চিকিৎসায় ইহার পাত ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সাধারণ লোকে যাহাকে গাটোপার্চ বলে তাহা অন্য বস্তু। আজকাল যেসকল শৃঙ্গবৎ কৃত্রিম পদার্থ প্রস্তুত হইতেছে তাহার কথা সংক্ষেপে বলিতেছি। –

নাইট্রিক অ্যাসিড তুলা ইত্যাদি হইতে সেলিউলয়েড হয়। ইহা কাচতুল্য স্বচ্ছ কিন্তু অন্য উপাদান যোগে রঞ্জিত চিত্রিত বা হাতির দাঁতের ন্যায় সাদা করা যায়। ফোটোগ্রাফের ফিল্ম, মোটর গাড়ির জানালা, হার্মেনিয়মের চাবি, পুতুল, চিরুনি, বোতাম প্রভৃতি অনেক জিনিসের উপাদান সেলিউলয়েড। অনেক চশমার ফ্রেমও

এই পদার্থ।

রবারের সহিত গন্ধক মিলাইয়া ইবনাইট বা ভল্‌কানাইট প্রস্তুত হয়। বাংলায় ইহাকে 'কাচকড়া' বলা হয়, যদিও কাচকড়ার মূল অর্থ কাছিমের খোলা। ইবনাইট স্বচ্ছ নয়। ইহা হইতে ফাউন্টেন পেন চিরুনি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

আরও নানাজাতীয় স্বচ্ছ বা শৃঙ্গবৎ পদার্থ বিভিন্ন নামে বাজারে চলিতেছে, যথা – সেলোফেন, ভিসকোজ, গ্যালালিথ, ব্যাকেলাইট ইত্যাদি। এগুলির উপাদান ও প্রস্তুতপ্রণালী বিভিন্ন। নকল রেশম, নকল হাতির দাঁত, নানারকম বার্নিশ, বোতাম, চিরুনি প্রভৃতি বহু শৌখিন জিনিস ঐসকল পদার্থ হইতে প্রস্তুত হয়।

বঙ্গভঙ্গের সময় যখন মেয়েরা কাচের চুড়ি বর্জন করিলেন তখন একটি অপূর্ব স্বদেশী পণ্য দেখা দিয়াছিল – 'আলুর চুড়ি'। ইহা বিলাতী সেলিউলয়েডের পাতা জুড়িয়া প্রস্তুত। আলুর সহিত ইহার কোনও সম্পর্ক নাই। বিলাতী সংবাদপত্রে মাঝে মাঝে অতিরঞ্জিত আজগুবী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের খবর বাহির হয়। বহুকালপূর্বে কোনও কাগজে পড়িয়াছিলাম গন্ধকাম্লে আলু ভিজাইয়া কৃত্রিম হস্তিদন্ত প্রস্তুত হইতেছে। বোধ হয় তাহা হইতেই আলুর চুড়ি নামটি রটিয়াছিল।

আর একটি ভ্রান্তিকর নাম সম্প্রতি সৃষ্টি হইয়াছে – 'আলপাকা শাড়ি'। আলপাকা একপ্রকার পশমী কাপড়। কিন্তু আলপাকা শাড়িতে পশমের লেশ নাই, ইহা কৃত্রিম রেশম হইতে প্রস্তুত।

টিন শব্দের অপপ্রয়োগ আমরা ইংরেজের কাছে শিখিয়াছি। ইহার প্রকৃত অর্থ রাং, ইংরেজীতে তাঁহাই মুখ্য অর্থ। কিন্তু আর এক অর্থ-রাং-এর লেপ দেওয়া লোহার পাত অথবা তাহা হইতে প্রস্তুত আধার, যথা 'কেরোসিনের টিন'। ঘর ছাহিবার করুগেটেড লোহায় দস্তার লেপ থাকে। তাহাও 'টিন' আখ্যা পাইয়াছে, যথা 'টিনের ছাদ'।

আজকাল মনোবিদ্যার উপর শিক্ষিত জনের প্রবল আগ্রহ জন্মিয়াছে, তাহার ফলে এই বিদ্যার বুলি সর্বত্র শোনা যাইতেছে। Psychological moment কথাটি বহুদিন হইতে সংবাদপত্র ও বক্তৃতার অপরিহার্য বুকনি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সম্প্রতি আর একটি শব্দ চলিতেছে – complex। অমুক লোক ভীরু বা অন্যের অনুগত, অতএব তাহার inferiority complex আছে। অমুক লোক সাঁতার দিতে ভালবাসে, অতএব তাহার water complex আছে। বিজ্ঞানীর দুর্ভাগ্য – তিনি মাথা ঘামাইয়া যে পরিভাষা রচনা করেন। সাধারণে তাহা কাড়িয়া লইয়া অপপ্রয়োগ করে, এবং অবশেষে একটা বিকৃত কদর্থ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া বিজ্ঞানীকে স্বাধিকারচ্যুত করে।

মানুষের কৌতুহলের সীমা নাই, সব ব্যাপারেরই সে কারণ জানিতে চায়। কিন্তু তাহার আত্মপ্রতারণার প্রবৃত্তিও অসাধারণ, তাই সে প্রমাদকে প্রমাণ মনে করে, বাক্‌ছলকে হেতু মনে করে। বাংলা মাসিক পত্রিকার জিজ্ঞাসা বিভাগের লেখকগণ অনেক সময় হাস্যকর অপবিজ্ঞানের অবতারণা করেন। কেহ প্রশ্ন করেন – বাতাস করিতে গায়ে পাখা ঠেকিলে তাহা মাটিতে ঠুকিতে হয়, ইহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কি। কেহ বা গ্রহণে হাঁড়ি ফেলার বৈজ্ঞানিক কারণ জানিতে চান। উত্তর যাহা আসে তাহাও চমৎকার। কিছুদিন পূর্বে 'প্রবাসী'র জিজ্ঞাসা বিভাগে একজন প্রশ্ন করিয়াছিলেন মাছির মল হইতে পুদিনা গাছ জন্মায়, ইহা সত্য কিনা। একাধিক ব্যক্তি উত্তর দিলেন – আলবৎ জন্মায়, ইহা আমাদের পরীক্ষিত। এই লইয়া কয়েক মাস তুমুল বিতন্ডা চলিল। অবশেষে মশা মারিবার জন্য কামান দাগিতে হইল, সম্পাদক মহাশয় আচার্য জগদীশচন্দ্রের মত প্রকাশ করিলেন – পুদিনা জন্মায় না।

আর একজন প্রশ্ন করিয়াছিলেন কর্পূর উবিয়া যায় কেন। উত্তর অনেক আসিল, সকলেই বলিলেন কর্পূর উদ্বায়ী পদার্থ তাই উবিয়া যায়। প্রশ্নকর্তা বোধ হয় তৃপ্ত হইয়াছেন, কারণ তিনি আর জেরা করেন নাই। কিন্তু উত্তরটি কৌতুককর। 'উদ্বায়ী'র অর্থ – যাহা উবিয়া যায়। উত্তরটি দাঁড়াইল এই – কর্পূর উবিয়া যায়, কারণ তাহা এমন বস্তু যাহা উবিয়া যায়। প্রশ্নকর্তা যে তিমিরে সেই তিমিরে রহিলেন। একবার এক গ্রাম্য যুবককে প্রশ্ন করিতে শুনিয়াছিলাম – কুইনিনে জ্বর সারে কেন। একজন মুরব্বী ব্যক্তি বুঝাইয়া দিলেন – কুইনিন জ্বরকে জব্দ করে, তাই জ্বর সারে।

কর্পূর উবিয়া যায় কেন, ইহার উত্তরে বিজ্ঞানী বলিবেন – জানি না। হয়তো কালক্রমে নির্ধারিত হইবে যে পদার্থের আণব সংস্থান অমুক প্রকার হইলে তাহা উদ্বায়ী হয়। তখন বলা চলিবে – কর্পূরের গঠনে অমুক বিশিষ্টতা আছে তাই উবিয়া যায়। কিন্তু ইহাতেই প্রশ্ন থামিবে না, ঐপ্রকার গঠনের জন্যই বা পদার্থ উদ্বায়ী হয় কেন? বিজ্ঞানী পুনর্বার বলিবেন – জানি না।

বিজ্ঞানের লক্ষ্য-জটিলকে অপেক্ষাকৃত সরল করা, বহু বিসদৃশ ব্যাপারের মধ্যে যোগসূত্র বাহির করা। বিজ্ঞান নির্ধারণ করে – অমুক ঘটনার সহিত অমুক ঘটনার অখন্ডনীয় সম্বন্ধ আছে, অর্থাৎ ইহাতে এই হয়। কেন হয় তাহার চূড়ান্ত জবাব বিজ্ঞান দিতে পারে না। গাছ হইতে স্খলিত হইলে ফল মাটিতে পড়ে; কারণ বলা হয় – পৃথিবীর আকর্ষণ। কেন আকর্ষণ করে বিজ্ঞান এখনও জানে না। জানিতে পারিলেও আবার নূতন সমস্যা উঠিবে। নিউটন আবিষ্কার করিয়াছেন, জড়পদার্থ মাত্রই পরস্পর আকর্ষণ করে। জড়ের এই ধর্মের নাম মহাকর্ষ বা gravitation। এই আকর্ষণের রীতি নির্দেশ করিয়া নিউটন যে সূত্র রচনা করিয়াছেন তাহা Law of Gravition, মহাকর্ষের নিয়ম। ইহাতে আকর্ষণের হেতুর উল্লেখ নাই। মানুষ মাত্রই মরে ইহা অবধারিত সত্য বা প্রাকৃতিক নিয়ম। মানুষের এই ধর্মের নাম মরত্ব। কিন্তু মৃত্যুর কারণ মরত্ব নয়।

কারণ নির্দেশের জন্য সাধারণ লোকে অপবিজ্ঞানের আশ্রয় লইয়া থাকে। ফল পড়ে কেন? কারণ পৃথিবীর আকর্ষণ। এই

প্রশ্নোত্তরে এবং কর্পূরের প্রশ্নোত্তরে কোনও প্রভেদ নাই, হেত্বাভাসকে হেতু বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। তবে একটা কথা বলা যাইতে পারে। উত্তরদাতা জানাইতে চান যে তিনি প্রশ্নকর্তা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বেশি খবর রাখেন। তিনি বলিতে চান – অনেক জিনিসই উবিয়া যায়, কর্পূর তাঁহাদের মধ্যে একটি; জড়পদার্থ মাত্রই পরস্পরকে আকর্ষণ করে, পৃথিবী কর্তৃক ফল আকর্ষণ তাঁহারই একটি দৃষ্টান্ত। কিন্তু কারণ নির্দেশ হইল না।

বিজ্ঞানশাস্ত্র বারংবার সতর্ক করিয়াছে – মানুষ যে সকল প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছে তাহা ঘটনার লক্ষিত রীতি মাত্র, ঘটনার কারণ নয়, laws are not causes। যাহাকে আমরা কারণ বলি তাহা ব্যাপার পরম্পরা বা ঘটনার সম্বন্ধ মাত্র, তাহার শেষ নাই, ইয়াত্তা নাই। যাহা চরম ও নিরপেক্ষ কারণ তাহা বিজ্ঞানীর অনধিগম্য। দার্শনিক স্মরণাতীত কাল হইতে তাহার সন্ধান করিতেছেন।

এই প্রসঙ্গে একটি অতিপরিচিত বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে-অদৃষ্টবাদ বা নিয়তিবাদ। ইহা পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের দান নয়, নিতান্তই ভারতীয় বস্তু। আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত ইহার বিবাদ নাই, কিন্তু সাধারণ লোকে যে অদৃষ্টবাদের আশ্রয় লয় তাহা অপবিজ্ঞান মাত্র।

বহু যুগের অভিজ্ঞতার ফলে মানুষের দূরদৃষ্টি জন্মিয়াছে, অতীত ও ভবিষ্যৎ অনেক ব্যাপার পরম্পরা সে নির্ণয় করিতে পারে। কিসে কি হয় মানুষ অনেকটা জানে এবং সেই জ্ঞানের প্রয়োগ দ্বারা প্রয়োজন সাধন করে। কতকগুলি জাগতিক ব্যাপার আমাদের বোধ্য বা সাধ্য, কিন্তু অধিকাংশই অবোধ্য বা অসাধ্য। প্রথমোক্ত বিষয়গুলি আমাদের 'দৃষ্ট' অর্থাৎ নির্ণেয়, শেষোক্ত বিষয়গুলি 'অদৃষ্ট' অর্থাৎ অনির্ণেয়। যাহা দৃষ্ট তাহাতে আমাদের কিছু হাত আছে, যাহা অদৃষ্ট তাঁহাতে মোটেই হাত নাই।

নিয়তিবাদী দার্শনিক বলেন – কিসে কি হইবে তাহা জগতের উৎপত্তির সঙ্গেই নিয়মিত হইয়া আছে, সমস্ত ব্যাপারই নিয়তি। মানুষের সাধ্য অসাধ্য সমস্তই নিয়তি, আমরা নিয়তি অনুসারেই পুরুষকার প্রয়োগ করি। কাজ সহজে উদ্ধার হইয়া গেলে নিয়তির কথা মনে আসে না। কিন্তু চেষ্টা বিফল হইলেই মনে পড়ে, নিয়তি মানুষের অবাধ্য, যত্ন করিলেও সব কাজ সিদ্ধ হয় না।

বিজ্ঞানও স্বীকার করে – এই জগৎ নিয়তির রাজ্য, সমস্ত ঘটনা কার্যকারণসূত্রে গ্রথিত অখন্ডনীয়রূপে নিয়ন্ত্রিত। অভিজ্ঞ ব্যক্তি কোনও কোনও বিষয়ের ভবিষ্যদুক্তি করিতে পারেন, যথা – অমুক দিন চন্দ্রগ্রহণ হইবে, অমুক লোকের শীঘ্র জেল হইবে। প্রাকৃতিক নিয়ম বা নিয়তির কিয়দংশ তাঁহার জানা আছে বলিয়াই পারেন। বিচক্ষণ দাবা খেলোয়াড় ভবিষ্যতের পাঁচ-ছয় চাল হিসাব করিয়া ঘুঁটি চালিয়া থাকে। কিন্তু যাহা মানুষের প্রতর্ক্য বা অনুমানগম্য তাহা সকল ক্ষেত্রে সাধ্য বা প্রতিকার্য নয়। আমাদের এমন শক্তি নাই যে চন্দ্রের গ্রহণ রোধ করি, কিন্তু এমন শক্তি থাকিতে পারে যাহাতে অমুকের কারাদন্ড নিবারণ করা যায়। এমন প্রাজ্ঞ যদি কেহ থাকেন যিনি সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়ম জানেন, তবে তিনি সর্বদ্রষ্টা ত্রিকালজ্ঞ। তাঁহার কাছে নিয়তি 'অদৃষ্ট' নয়, দৃষ্ট ও স্পষ্ট। তিনি মানুষ, তাই সর্বশক্তিমান হইতে পারেন না, কিন্তু অন্য মানুষের তুলনায় তাঁহার সাধ্যের সীমা অতি বৃহৎ। জ্ঞানবৃদ্ধির ফলে মানবসমাজ এইরূপে উত্তরোত্তর অনাগতবিধাতা হইতেছে।

কূট তার্কিক বলিবেন – প্রকৃতির অখন্ডনীয় বিধি মানিব কেন? তোমার আমার বুদ্ধিতে ফল মাটিতে পড়ে, যথাকলে চন্দ্রগ্রহণ হয়, দুই ও তিনে পাঁচ হয়। কিন্তু এমন ভুবন বা এমন অবস্থা থাকিতে পারে যেখানে বিধির ব্যতিক্রম হয়। বিজ্ঞানী উত্তর দেন – তোমার সংশয় যথার্থ। কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্র এই চিরপরিচিত ভুবন এবং তোমার আমার তুল্য প্রকৃতিস্থ মানুষের দৃষ্টি। যখন অন্য ভুবনে যাইব বা অন্য প্রকার দেখিব তখন অন্য বিজ্ঞান রচনা করিব। বিজ্ঞানী যে সূত্র প্রণয়ন করেন তাহা কখনও কখনও সংশোধন করিতে হয় সত্য, কিন্তু তাহা প্রাকৃতিক বিধির পরিবর্তনের ফলে নয়।

অতএব, অদৃষ্টের অর্থ – অনির্ণেয় ও অসাধ্য ঘটনাসমূহ; নিয়তির অর্থ – সমস্ত ঘটনার অখন্ডনীয় সম্বন্ধ বা আনুপূর্ব। ঘটনার কারণ অদৃষ্ট বা নিয়তি নয়। কিন্তু সাধারণ লোকে অদৃষ্টকে অনর্থক টানিয়া আনিয়া সুখদুঃখের ব্যাখ্যা করে। জীবনযাত্রা যখন নিরুদ্‌বেগে চলিয়া যায় তখন কারণ জানিবার ঔৎসুক্য থাকে না। কিন্তু যদি একটা বিপদ ঘটে, কিংবা যদি কোন পরিচিত হঠাৎ বড়লোক হয়, তখনই মনে কষ্টকর প্রশ্ন আসে – কেন এমন হইল? বিজ্ঞলোক ব্যাখ্যা করেন – বাপু, কেন হইল সেটা বুঝিলে না! উত্তরে যদি বলা হয় – কলেরা, সর্পাঘাত, অনেক বয়স – তবে একটা কারণ বুঝা যায়। কিন্তু ইহা বলা বৃথা – মরণের অনির্ণেয়তা, মরিবার কারণ। অথচ, 'অদৃষ্ট' বলিলে ইহাই বলা হয়। যাহা অবিসংবাদিত সত্য বা truism তাহা শুনিলে কাহারও কৌতুহলনিবৃত্তি বা সান্ত্বনালাভ হয় না, সুতরাং ইহাও বলা বৃথা – অমুক লোকটি ঘটনা পরম্পরার ফলে মরিয়াছে। অথচ, 'নিয়তি' বলিলে ইহাই বলা হয়। 'অদৃষ্ট' ও 'নিয়তি' শব্দ সাধারণের নিকট প্রকৃত অর্থ হারাইয়াছে এবং বিধাতার আসন পাইয়া সুখদুঃখের নিগূঢ় কারণ রূপে গণ্য হইতেছে।

অধ্যাপক Poyinting-এর উক্তিটি উদ্ধারযোগ্য। –

'No long time ago physical laws were quite commonly described as the Fixed Laws of Nature, and were supposed sufficient in themselves to govern the universe...A law of nature explains nothing – it has no governing power, it is but a descriptive formula which the careless has sometimes personified.■

বিজ্ঞানের খবর

নভেম্বর, ২০২১

১. ●মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা 'নাসা' মঙ্গলগ্রহে 'কিউরিওসিটি' নামক যে চলযান (বা রোভার) প্রেরণ করেছিল সেটি মঙ্গলে পদার্পণ করে ২০১২ খ্রিস্টাব্দের ৬ই অগাস্ট। সেই থেকে চলযানটি মঙ্গলের মাটিতে ঘুরে ঘুরে মঙ্গলের মাটি সংগ্রহ করেছে ও সেই মাটি পরীক্ষা করেছে। চলযানটির ভিতরে স্থাপিত নমুনা বিশ্লেষক যন্ত্রটি মঙ্গলের মাটিতে জৈব যৌগের অস্তিত্ব প্রমাণ করেছে পূর্বেই। সম্প্রতি, মঙ্গলের মাটিতে বেঞ্জোয়িক অ্যাসিড ও অ্যামোনিয়ার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে। বিজ্ঞানীদের আপাত লক্ষ্য হল এই সকল জৈব পদার্থগুলির উৎস কি তা জানা ও অতীতে মঙ্গলে কোন প্রাণের অস্তিত্ব ছিল কিনা তা অনুসন্ধান করা। (নেচার অ্যাস্ট্রোনমি)

৩. ●পৃথিবী থেকে ১২.৯ বিলিয়ন আলোক-বর্ষ দূরবর্তী একটি গ্যালাক্সি-তে জল ও কার্বন-মনোক্সাইডের অস্তিত্ব ধরা পড়েছে। এ এল এম এ (আটাকামা লার্জ মিলিমিটার অ্যারে)-র মহাকাশ বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে তাদের গবেষণায় সম্প্রতি এটা ধরা পড়েছে। পেরুর আটাকামা মরুভূমিতে প্রায় ৫০০০ মিটার উচ্চতায় স্থাপিত অত্যন্ত শক্তিশালী রেডিও টেলিস্কোপটি ২০১১ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর থেকে মহাকাশ সম্বন্ধে নিত্য নতুন তথ্যাদি সরবরাহ করে চলেছে। (অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল জার্নাল)

৪. ●**মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় গবেষণা পরিষদ তাদের জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিপদার্থ *বিজ্ঞান সংক্রান্ত সপ্তম সার্ভে, ২০২০-তে আগামী দশ বছরে তারা জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষণার কোন কোন বিষয়কে তারা অগ্রাধিকার দেবে তা প্রকাশিত করেছে। এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে বাসযোগ্য বর্হিগ্রহ, অন্তরীক্ষে প্রাণের অস্তিত্ব, কৃষ্ণ-গহ্বর, নিউট্রন নক্ষত্র এবং ছায়াপথের উৎপত্তি ও বিবর্তন সংক্রান্ত গবেষণাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে ও তাতে অর্থ বিনিয়োগ করা হবে।** (নিউ ইয়র্ক টাইমস)

●মানব শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের এক্স-রে প্রতিচ্ছবি গঠনের ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক প্রযুক্তির আবিস্কার করেছেন বিজ্ঞানীরা। যার নাম সিঙ্ক্রোটোন এক্স-রে ইমেজিং। এই প্রযুক্তিতে ফুসফুসের মতো সুক্ষ্ম যন্ত্রের কোষীয় স্তর পর্যন্ত স্পষ্ট দৃশ্যমান হয়। কোভিড-১৯ আক্রান্তে মৃত ব্যক্তির ফুসফুসের সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম পরিবর্তনও স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে এই প্রযুক্তিতে। (ফিজিক্স ওয়ার্ল্ড)

●বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে স্তন্যপায়ী প্রাণীর মস্তিষ্ক শরীরে অতীতের কোন প্রদাহ বা সংক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার ঘটনা মনে রাখে। মস্তিষ্কের একটি অংশ ইন্সুলার কর্টেক্স এই বিশেষ কাজটির জন্য দায়ী। শরীরে পুনরায় একই ঘটনা ঘটলে মস্তিষ্ক অনুরূপ ভাবে ক্রিয়া করে ও রোগ প্রতিরোধ প্রক্রিয়া জারী রাখে। (কোয়ান্টা ম্যাগাজিন)

১০. ●বিজ্ঞানীরা এক ধরনের চুইং গাম তৈরী করতে সক্ষম হয়েছেন যা কোভিড-১৯ ভাইরাস সংক্রমণে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। চুইং গামটি একটি উদ্ভিদজাত প্রোটীন যা মুখে রেখে চিবালে ভাইরাসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিষ্ক্রিয় করে দিতে পারে। আমেরিকার কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা এই খবর মলিকিউলার থেরাপি নামক জার্নালে প্রকাশ করেছে।

১১. ●আকাশ গঙ্গার সর্পিল বাহুগুলির মধ্যে হাল্কা পালকের মতো মেঘ নিয়ে বিজ্ঞানীদের কৌতুহল বহুদিনের। আটাকামায় উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন অ্যাপেক্স দূরবীণ এর সাহায্যে মহাকাশ বিজ্ঞানীরা পর্যবেক্ষণ করেছেন যে আকাশ গঙ্গার সর্পিল বাহুগুলির মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করছে কার্বন-মনো-অক্সাইড গ্যাস। গ্যাসটি অত্যন্ত ঠান্ডা ও ঘনীভূত অবস্থায় রয়েছে বলে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন। (অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল জার্নাল)

১৬. ●অনেক মানুষ আছেন যারা প্রকৃতিগতভাবে এইচ আই ভি সহনশীল আবার অনেকে আছেন যারা জিনগতভাবে এই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু একবার এইচ আই ভি সংক্রামিত হবার পর কোন চিকিৎসা ও ড্রাগ ছাড়াই রোগমুক্ত হবার নজির দ্বিতীয় বারের লক্ষ্য করলেন বিজ্ঞানীরা। সম্প্রতি আর্জেন্টিনার এক মহিলার শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা আপনা আপনি গড়ে ওঠার ফলে শরীর ভাইরাসমুক্ত হয়। এর কারণ বিজ্ঞানীরা অনুসন্ধান করছেন। (বিবিসি নিউজ)

২২. ●ইউরোপিয়ান সোসাইটি অব কার্ডিওলজি প্রকাশিত এক গবেষণা পত্রে জানানো হয়েছে যে কার্ডিওভাস্কুলার ঝুঁকি সম্পন্ন রোগীর ক্ষেত্রে অ্যাসপিরিন প্রয়োগের ফলে হৃদস্পন্দন বন্ধ হবার আশঙ্কা ২৬ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। প্রায় তিরিশ হাজার রোগীর উপর পরীক্ষা চালিয়ে বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন।

২৪. ●মহাকাশে উল্কাপাতের ঘটনা খুবই স্বাভাবিক। পৃথিবীর ইতিহাসেও উল্কাপাতের অনেক উদাহরণ রয়েছে। বড় আকারের কোন উল্কা পৃথিবীর দিকে উচ্চগতিতে ধাবমান হলে তা থেকে রক্ষা পাবার কি কোন পথ আছে? সম্প্রতি

মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা 'নাসা' ও জন হপস্কিন অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্স ল্যাবরেটরি এর যৌথ উদ্যোগে বিজ্ঞানীরা মহাকাশে একটি পরীক্ষা সংঘটিত করতে চলেছেন। যার নাম ডাবল অ্যাস্টারয়েড রিডাইরেক্সন টেস্ট (ডার্ট)। এই পরীক্ষায় পৃথিবীর কাছাকাছি ঘূর্ণায়মান মহাজাগতিক বস্তুর উপর কৃত্রিম সংঘর্ষ ঘটিয়ে তার গতি ও অভিমুখ কি ভাবে পরিবর্তন করা যায় তা দেখা হবে। সেই ফলাফলের উপর ভিত্তি করে পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসা উল্কাপিন্ডের সঙ্গে সংঘর্ষ কি ভাবে এড়ানো যায় বিজ্ঞানীরা বোঝার চেষ্টা করবেন। সেই পরীক্ষা সংঘঠিত হতে চলেছে সেপ্টেম্বর, ২০২২ নাগাদ। (বিবিসি নিউজ)

ডিসেম্বর, ২০২১

১. ●আফ্রিকার তাঞ্জানিয়া অঞ্চলে ভূতত্ত্ববিদেরা প্রাচীন মানুষের পদচিহ্ন আবিষ্কার করেছেন। বিজ্ঞানীদের অনুমান সেগুলি প্রায় ৩৫ লক্ষ বছর পূর্বে সৃষ্ট। এর আগে ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে ইথিওপিয়ায় বিজ্ঞানীরা প্রাচীন মানুষের অসম্পূর্ণ কঙ্কাল আবিষ্কার করেছিলেন। যার নাম দেওয়া হয়েছিল 'লুসি'। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন অধুনা আবিস্কৃত পদচিহ্নগুলি লুসি-র সমসাময়িক। (সায়েন্স নিউজ)

১০. ●জাপানের জুনটেন্ডো বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক জানিয়েছেন যে তাঁরা একটি প্রতিষেধক আবিষ্কার করেছেন যা বুড়িয়ে যাওয়াকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম। কোষ বিভাজনে অক্ষম কোষগুলিই প্রধানতঃ বুড়িয়ে যাওয়ার প্রধান কারণ। ইঁদুরের উপর ঐ প্রতিষেধক ব্যবহার করে দেখা গেছে তা অক্ষম কোষগুলিকে দেহ থেকে বের করে দিতে সক্ষম। মানুষের উপর এই পরীক্ষার কথা ভাবা হচ্ছে। (জাপান টাইমস)

১৩. ●পশ্চিম আন্টার্টিকার বৃহৎ হিমশৈল থোয়েটস-এর স্থায়িত্ব নিয়ে বিজ্ঞানীরা সংশয় প্রকাশ করেছেন। আমেরিকার ও বৃটিশ বিজ্ঞানীদের যৌথ উদ্যোগে এক গবেষণায় জানা গেছে আগামী ৫ থেকে ১০ বছরের মধ্যে এটি ভেঙ্গে পড়বে। তাঁরা আরও বলেছেন এই হিমশৈলে সঞ্চিত সমস্ত বরফ যদি গলে যায় তাহলে সমুদ্রের জলতল ৬৫ সেমি পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে পারে। (বিবিসি নিউজ)

১৬. ●বৃটিশ বিজ্ঞানীরা নিউক্লীয় সংযোজন বিক্রিয়া থেকে উদ্ভূত তাপশক্তিকে ব্যবহার করে বিদ্যুৎ বানানোর যে গবেষণা শুরু করেছে, সেই গবেষণায় এক উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে বলে তোকামাক সংস্থা জানিয়েছে। ফিউশন রিয়াক্টরের নব আবিস্কৃত নক্সা ব্যবহারে শক্তি উৎপাদনের খরচ ৫০ শতাংশ বা তার বেশি হ্রাস পেতে পারে বলে বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন। (তোকামাক এনার্জি)

২৫. ●হাবলস স্পেস টেলিস্কোপ এর উত্তরসূরী হিসাবে জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ মহাকাশে সফলভাবে পাঠাতে সক্ষম হলেন মহাকাশ বিজ্ঞানীরা। মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা, ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সী ও কানাডিয়ান স্পেস এজেন্সী-র যৌথ উদ্যোগে প্রেরিত এই অত্যাধুনিক দূরবীন যন্ত্রটির কার্যপ্রণালী অত্যন্ত জটিল। (নাসা)

জানুয়ারী, ২০২২

৫. ● কেমব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয় ও ডেনমার্ক সেরাম ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা এক গবেষণায় জানতে সক্ষম হয়েছেন কিভাবে শরীরে এন্টিবায়োটিক প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে এন্টিবায়োটিক গ্রহণ না করেও তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে উঠতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় জীব ও উদ্ভিদ জগত তথা পরিবেশও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। (পিবিএস নিউজ)

৬. ●বায়ুমন্ডলে মিথেন গ্যাসের মাত্রা মানব ইতিহাসে সর্বাধিক স্তরে পৌঁছল। গ্রীন হাউস গ্যাস হিসাবে চিহ্নিত মিথেন গ্যাসের বর্তমান বায়ুমন্ডলে ঘনত্ব ১৯০০ পিপিবি। অর্থাৎ প্রতি বিলিয়ন ($১০^৯$) ভাগ বাতাসে ১৯০০ ভাগ মিথেন। ২০০৭ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে বৃদ্ধির হার উদ্বেগজনক ভাবে বেড়ে গেছে বলে বিজ্ঞানী জানাচ্ছেন। বাতাসে মিথেন গ্যাসের উৎসগুলি হল, জলাজমি, জীবাশ্ম জ্বালানী উত্তোলন, পশু পালন, জমি ভরাট, ধান চাষ, গাছ-দহন, উই পোকা ইত্যাদি। তবে বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন এই বৃদ্ধির ৮৫ শতাংশ প্রাকৃতিক কারণেই ঘটছে। (নেচার)

১০. ●মেরীল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব মেডিসিন বিভাগের চিকিৎসকেরা মানুষের শরীরে শূয়োরের হৃদপিন্ড প্রতিস্থাপন করতে সফল হয়েছেন। শূয়োরটি ছিল জিনগতভাবে মডিফাই করা। গ্রহীতা ৫৭ বছরের ডেভিড বেনেট, তিনি বহুদিন যাবত হৃদপিন্ডের সমস্যায় ভুগছিলেন। হৃদপিন্ড চিকিৎসার ক্ষেত্রে এই আন্তঃপ্রজাতীয় অঙ্গ প্রতিস্থাপন নিশ্চিতভাবে ঐতিহাসিক। (মেরীল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয় মেডিক্যাল সেন্টার)

১১. ●একটি ভূতাত্ত্বিক গবেষণায় জানা গেছে প্রায় ৯ হাজার বছর পূর্বে পৃথিবীতে প্রচুর পরিমাণে সৌর শক্তিকণার আগমন ঘটেছিল। মেরু অঞ্চলে জমে থাকা প্রাচীন বরফ পরীক্ষা করে তাতে প্রচুর পরিমাণে বেরিলিয়াম-১০ ও ক্লোরিন-৩৬ পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। এই ফলাফল উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মহাজাগতিক (সৌর) শক্তির আগমনকে সূচিত করে। (লুন্ড বিশ্ববিদ্যালয়)

১২.●স্ট্যানফোর্ড মেডিসিনের বিজ্ঞানীরা মানুষের জিনোমের ক্রম-নির্ণয় (সিকোয়েন্সিং) এর ক্ষেত্রে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন। সম্পূর্ণ জিনোমের সিকোয়েন্সিং সম্পূর্ণ করতে পূর্বে ৮-১০ ঘন্টা সময় লাগত। বর্তমান রেকর্ড হল ৫ ঘন্টা ২ মিনিট। এর ফলে জিন ঘটিত রোগ আরও দ্রুত নির্ণয় করা সম্ভব হবে। (স্ট্যানফোর্ড)

●হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাকাশ বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন আমাদের পৃথিবী এক হাজার আলোকবর্ষ চওড়া সুবিশাল শূন্যস্থানের মধ্যে অবস্থান করছে। যার নাম সুপারবাবল। 'নেচার' পত্রিকায় প্রকাশিত এক গবেষণা পত্রে দেখানো হয়েছে ১৪ মিলিয়ন বছরের বিবর্তনের ফলে কিভাবে আজকের গ্যালাক্সি সৃষ্টি হয়েছে।(নেচার)

১৯. ●একটি মেডিক্যাল প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে সারা বিশ্বে প্রায় ৫০ লক্ষ মৃত্যু, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ঘটেছে এন্টিবায়োটিক-প্রতিরোধ সৃষ্টির কারণে। এই সংখ্যা এইডস এর কারণে মৃত্যুর সংখ্যার থেকে অনেক বেশি। গবেষকেরা অনুমান করছেন এই সংখ্যা কোভিড-১৯ অতিমারীর পর্যায়ে অনিয়ন্ত্রিত এন্টিবায়োটিক সেবনের ফলে অনেক বৃদ্ধি পাবে। (গ্লোবাল নিউজ)

২৬. ●হাত ও পা-এর মতো অঙ্গ নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর তা কি আবার প্রাকৃতিকভাবে গজিয়ে উঠতে পারে? সিনেমার সুপার হিরোদের ক্ষেত্রে তা আকছার দেখা যায়। কিন্তু বাস্তবে? মানুষের ক্ষেত্রে তা নয়ই। এবার একটি গবেষকদের দল একটি পূর্ণ বয়স্ক ব্যাঙ-এর নষ্ট হয়ে যাওয়া পা গজিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। হাভার্ড ও অন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা পাঁচটি ড্রাগের মিশ্রণ প্রয়োগ করে এই যুগান্তকারী ঘটনা ঘটিয়েছেন। কিছু জীবের প্রাকৃতিগতভাবে এমন ক্ষমতা থাকলেও ব্যাঙ বা মানুষের তা নেই। মারাত্মক ডায়াবেটিস বা অন্যান্য রোগে মানুষের অঙ্গহানি হয়। বিজ্ঞানীদের এই সাফল্য আগামীদিনে মানুষের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। (সায়েন্স এডভান্স)

ফেব্রুয়ারী, ২০২২

১. ●সাংহাই এর জিয়াও টং বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদ্র বিজ্ঞানীরা একটি গবেষণায় জানিয়েছেন যে বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রের জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে। এর ফলে সামুদ্রিক প্রাণীদের শ্বাস-প্রশ্বাস জনিত অসুবিধা দেখা যাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন বর্তমানে এই প্রভাব সমুদ্রের মধ্য-গভীরতায় (২০০-১০০০ মিটার) দেখা গেলেও ২০৮০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ সমুদ্রের সর্বস্তরে তা ছড়িয়ে পড়বে। তবে এই পরিবর্তন সামুদ্রিক প্রাণীরা অভিযোজনের মাধ্যমে কতটা মানিয়ে নিতে পারবে তা জানানো হয়নি। (আমেরিকান জিওফিজিক্যাল ইউনিয়ন)

৪. ●ক্যালিফোর্নিয়ার এক জনস্বাস্থ্য বিষয়ক বিভাগের গবেষণায় জানানো হয়েছে কোভিড-১৯ ভাইরাসের সংক্রমণের বিচারে সার্জিকাল মাস্কের থেকে এন-৯৫ ও কেএন-৯৫ মাস্কের কার্যকারিতা অনেক বেশি। বদ্ধ পরিবেশে সার্জিক্যাল মাস্ক ব্যবহার করে কোভিড-১৯ ভাইরাস পরীক্ষা পজিটিভ হবার হার ৬৬ শতাংশ হ্রাস করে, অন্য দিকে এন-৯৫ ও কেএন-৯৫ মাস্কের ক্ষেত্রে তা ৮৩ শতাংশ।(ওয়াশিংটন পোষ্ট)

৯. ●বৃটেনের জেট ল্যাবরেটরীর বিজ্ঞানীরা নিউক্লীয় সংযোজন বিক্রিয়াজাত শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। হাইড্রোজেনের আইসোটোপ ডয়ট্রিয়াম ও ট্রিটিয়ামকে সংযোজন ঘটিয়ে বিপুল পরিমাণ শক্তি নির্গত হয়। বিজ্ঞানীরা এই পদ্ধতিতে ৫ সেকেন্ডে ৫৯ মেগাজুল শক্তি নির্গত করতে সক্ষম হয়েছেন যা ১১ মেগাওয়াট ক্ষমতার সমতুল্য। (বিবিসি নিউজ)

১০. ●এই প্রথম বিজ্ঞানীরা মানুষের বুড়িয়ে যাওয়ার সঙ্গে সীমাবদ্ধ ক্যালোরী গ্রহণ এর কি সম্পর্ক তা জানার জন্য নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাল। ইঁদুরের উপর ঐ পরীক্ষার ফলাফল জানাচ্ছে সীমাবদ্ধ ক্যালোরি প্রয়োগ করে স্থূলতা হ্রাস-এর পাশাপাশি সাধারণ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিজ্ঞানীরা ইঁদুরের শরীর থেকে একটি জিন খুঁজে পেয়েছেন যা এই ব্যাপারে সম্পর্কিত। মানুষের ক্ষেত্রেও প্রায় অনুরূপ ফলাফল পাওয়া গেলেও আরও সুনির্দিষ্ট গবেষণা প্রয়োজন রয়েছে। (সায়েন্স ডেইলী)

১৫. ●মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা 'নাসা' জানাচ্ছে, ২০৫০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ আমেরিকার সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলগুলি জলস্তর ২৫ থেকে ৩০ সেমি বৃদ্ধির কারণে প্লাবিত হবে। যার সম্ভাবনা এখনই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা আরও জানিয়েছেন ২১৫০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করবে। গত একশ বছরে জলস্তর যতটা বৃদ্ধি পেয়েছে আগামী ত্রিশ বছরে প্রায় ততটা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। (নাসা)

২৮. ●জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ইন্টার গভর্নমেন্টাল প্যানেল (আইপিসিসি) তাদের ষষ্ঠ মূল্যায়ন-এর দ্বিতীয় খন্ড প্রকাশ করেছে। এই খন্ডের উপসংহারে জলবায়ু পরিবর্তনের অধিকাংশ কারণগুলিকে একমুখী হিসাবে দেখানো হয়েছে। (আইপিসিসি) ■

অতিথি কলম ঃ

'সহি জাতীয়তাবাদী চিকিৎসাবিজ্ঞান' ও আমরা

–সাম্যজিৎ গাঙ্গুলী
(কলকাতা মেডিকেল কলেজ)

আচ্ছা, চিকিৎসাবিজ্ঞানের কী দেশ হয়? বা জাতি, বা ধর্ম? বিজ্ঞান তো বিশেষ জ্ঞান, সত্যের চর্চা। সেই সত্য কী ব্যক্তিবিশেষের জন্য আলাদা হয়ে যায়? বদলে যায় দেশ-দেশান্তরে, ধর্মের ফারাকে? হয়তো আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে উত্তরটা 'না'। তবে আমাদের দেশের জনতার 'বাপ-মা' হয়ে ওঠা সরকারের মতে, 'হ্যাঁ'। শুধু মিনমিনে গলায় 'হ্যাঁ' না, রীতিমতো জোরদার গলায় ধমক এটা। স্রেফ দাবি না, দরকারে ঠুসে গিলিয়ে দেবার দৃঢ়তা রাখা সরকারি নীতি। এমনিতে দৃঢ়তা জিনিসটা খুব জরুরি, 'পনেরো লাখ ফেরত দেব' বলেও ফেরত না দেওয়ার মতো দৃঢ়তার অভাব ভালো না। তবে ওই, বেশি ভালোও ভালো নয় কিনা। এবং তাই, আমরা, যারা বিজ্ঞান পড়ি, চিকিৎসাবিদ্যার ছাত্র, তারা এই বেশি দৃঢ়তার গুঁতোয় একটু গ্যাঁড়াকলে পড়ে গেছি। সেই গ্যাঁড়াকলের বিস্তৃত বর্ণনা করতেই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

গ্যাঁড়াকলটা সত্যি বলতে, নতুন না। দেশি, ঐতিহ্যবাহী বনাম বিলিতির দ্বন্দ্ব বহুকাল যাবৎ চলছে। ভারতে আয়ুর্বেদের ইতিহাস পুরোনো, এককালে সত্যিই গর্ব করার মতো কাজ হয়েছে এদেশে। এবং তাই, অতীতের গর্বে বলীয়ান হয়ে ঢাক পেটানোও আছে। সহস্রাব্দের বেশি সময় ধরে গবেষণার অভাবে মোটা ধুলোর আস্তরণ জমেছে, এখন বিজ্ঞানের বদলে কুসংস্কারই বেশি, তবুও জনতার নির্ভরতা কমেনি। আর এই পালে আরোই হাওয়া লেগেছে ২০১৪ পরবর্তী এনডিএ শাসনে। ক্ষমতায় আসার বছরেই ৯ই ডিসেম্বর নরেন্দ্র মোদির সরকার তৈরী করে আয়ুষ মন্ত্রক – 'অল্টারনেটিভ মেডিসেনের' জন্য। মন্ত্রকের লক্ষ্য হলো আয়ুর্বেদ, যোগ, ন্যাচুরপ্যাথি, ইউনানী, সিদ্ধা, সোয়া রিগপা ও হোমিওপ্যাথি – মোট এই সাতটি বিকল্প চিকিৎসাব্যবস্থায় গবেষণা, শিক্ষা ও চিকিৎসার অগ্রগতি ঘটানো। এখানে উল্লেখ করে রাখা ভালো, এই তথাকথিত 'চিকিৎসাব্যবস্থা'-র বেশিরভাগই প্রমাণিত কিছু নয়, ভুজুংভাজুং কার্যত। হোমিওপ্যাথি তো অপবিজ্ঞান বলে প্রমাণিত। আর আয়ুর্বেদের বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর রয়েছে বহু যুগের বিজ্ঞানবিমুখতার ভার – এখনো পাঠ্যক্রমে পিত্ত-বায়ু-কফ থেকে অসুখ সারাবার মন্ত্র বিরাজ করে সগৌরবে। হ্যাঁ জনতার করের টাকায় এই 'আয়ুষ'-এরই প্রচার, প্রসার চলে। কী চলে? চলে বিজ্ঞাপন, এবং চলে আলটপকা ঘোষণা। এখন অবধি আয়ুষ মন্ত্রকের অধীনে কটি peer reviewed গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে এই সাতটি চিকিৎসা ব্যবস্থার বিষয়ে? উত্তর মেলে না। যেটুকু 'রিসার্চ' হয় (তাকে রিসার্চ বলাও অন্যায়), এবং তার 'অদ্ভুত' ফলাফল নিয়ে যা নৃত্য চলে তাতে দেশের সম্মান নষ্ট আর জনস্বাস্থ্যে বিঘ্ন বাদে আর কিছুই হয় না। করোনার জন্য 'করোনিল' নামক একটি sham drug হোক বা এর আগেও ডেঙ্গু, সোয়াইন ফ্লু বা ডায়াবেটিসের ওষুধের ক্ষেত্রে একই রকম অবাস্তব দাবিদাওয়া – কম জিনিস ঘটেনি এই গত বছর দুয়েকে। তবুও, কেন্দ্রীয় সরকার নিজের স্থানে অনড়।

স্বাভাবিক প্রশ্ন জাগে, হঠাৎ করে স্বাস্থ্যের মতো এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে সরকারের এরকম বিজ্ঞান-বিরোধী মনোভাব কেন? কারণ, অন্ততপক্ষে আমার সাধারণ বুদ্ধি মতে, দুটি। প্রথম কারণটা বুঝতে গেলে আমাদের একটু আশেপাশে এবং অতীতে তাকাতে হবে। বেশি দিন না, এই তো ২০১৫-র ঘটনা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের স্লোগানটা মনে পড়ে? 'মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন' – দেশের আদি গৌরব পুনরুদ্ধার করো। দেশের আদি গৌরব কী ছিল সেটা বুঝিয়ে বলা মুশকিল, সেটা কবে, কিভাবে হারিয়ে গেল তাও অজানা। খালি জানি হারিয়ে গেছে, এবং হারিয়েছে কাদের দোষে। উগ্র দক্ষিণপন্থী রাজনীতি তথা ফ্যাসিবাদের উত্থানের টেক্সটবুক উদাহরণ ছিল ট্রাম্পের এই প্রচারটা। ঠিক হিটলার বা মুসোলিনির পথেই – ট্রাম্প খালি জার্মান বা রোমান সাম্রাজ্যের গৌরবের জায়গায় বসিয়েছিলেন আমেরিকান গৌরবকে, শত্রুর জায়গায় কমিউনিস্ট ও ইহুদিদের সাথে জুড়ে দিয়েছিলেন অভিবাসীদেরও। আমরা কী সেই একই ছাপ দেখতে পাচ্ছি না কেন্দ্রীয় শাসকের রাজনীতিতেও? আত্মনির্ভরতা বা বিশ্বগুরুর মোড়কে ব্রাহ্মণ্য, হিন্দু গৌরব বনাম মুসলিম, 'সেকুলার' ও বামপন্থীদের করা ঐতিহ্যের উপর আঘাত, রাজনৈতিক লাইনে কিন্তু ভীষণ, ভীষণ মিল। এবং যেহেতু ফ্যাসিবাদের নিয়ম মেনেই অতীতের ঐতিহ্যে ফিরে যাবার একটা চেষ্টা আছে, তাই প্রাচীন ভারতের স্মৃতিবিজড়িত আয়ুর্বেদকেও তুলে ধরার

প্রচেষ্টা পশ্চিমা আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থার বিরুদ্ধে। না, স্রেফ রাজনৈতিক assumption থেকে কথাগুলো বলা নয়। রীতিমতো প্রমাণ আছে। সাম্প্রতিককালে আমার কলেজ, মেডিকেল কলেজ কলকাতায় এমবিবিএস প্রথম বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রথম দিনের ক্লাসে 'চরক শপথ' পাঠ করানো নিয়ে তুমুল হইচই হয়েছে বিভিন্ন মহলে। এই প্রমাণটি চাক্ষুষ দেখা আমার সেই সময়ই। হিপোক্রেটিক ওথের বদলে চরক শপথ পাঠ করানো নিয়ে যেমন বিতর্ক হয়, তেমনই আশ্চর্যের ঘটনা হলো সমাবর্তনের বদলে ওরিয়েন্টেশনের দিনই চরক শপথ পাঠ করানো। আমরা ছাত্ররা প্রতিবাদ করলে নবনিযুক্ত প্রিন্সিপাল স্যার ভুল স্বীকার করে নেন, বলেন তাঁরই 'অত্যুৎসাহে' ঘটেছে ঘটনাটি, NMC বা ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশনের নির্দেশিকা ছিল না ওইদিনই শপথ পাঠ করানোর, ওটা সরকারি সাজেশন মাত্র। কিন্তু এসবের থেকে অনেক বেশি চিত্তাকর্ষক অন্য জিনিস চোখে পড়ে আমাদের – হিপোক্রেটিক ওথকে চরক শপথ দিয়ে রিপ্লেস করার পিছনে সরকারি যুক্তি। 'Replacement of Hippocrates Oath with Charak Shapath as Charak belonged to our motherland - Oath taking to be conducted during white Coat Ceremony in local language/s/Vernaculars' (sic) – এমনটাই ছিল দেশের সব মেডিকেল কলেজের প্রতিনিধিদের নিয়ে হওয়া এনএমসি-র মিটিংয়ের মিনিটসের দ্বিতীয় পয়েন্ট। কোনো ঘোরপ্যাঁচ নেই, সরাসরি জাতীয়তাবাদী আবেগ উস্কে দেবার চেষ্টা।

এখানে একটু দেশপ্রেমিক পাঠক প্রশ্ন তুলতেই পারেন, কিসের আপত্তি আমাদের চরক শপথে? বিদেশি হিপোক্রেটিসের বদলে দেশি চরক কম কিসে? ন্যায্য প্রশ্ন এবং এই প্রশ্নের উত্তরেই লুকিয়ে আছে এই 'জাতীয়তাবাদী' স্বাস্থ্য মডেলের অন্যতম বিপজ্জনক দিক। বিষয়টা বুঝতে গেলে আগে চোখ রাখা যাক একটু হিপোক্রেটিসের দিকে। হিপোক্রেটিস ভদ্রলোক গ্রিক, জন্ম খ্রিষ্টপূর্ব ৪৬০ নাগাদ, গ্রিসের কস দ্বীপে। সেযুগে চিকিৎসাব্যবস্থায় অসীম অবদান রাখেন তিনি, তাই পশ্চিমে এখনো ফাদার অফ মেডিসিন নামে পরিচিত। হিপোক্রেটিক ওথ বা শপথও তাঁর নামেই। আদ্যিকালের, সেই আসল শপথে, সত্যি বলতে ত্রুটির অভাব ছিল না। শুরুতেই একগাদা গ্রিক দেব-দেবীর প্রতি অর্ঘ্য নিবেদন থেকে চিকিৎসার প্রয়োজনে বিষ প্রয়োগ বা গর্ভপাতের বিরোধিতা, সংশয়ের জায়গা প্রচুর। কিন্তু এখন যে শপথটা সমাবর্তনের দিন নবীন চিকিৎসকদের পাঠ করতে হয়, সেটা সেই প্রাচীন গ্রিক শপথ নয়। দুটির মিল স্রেফ নামেই। আধুনিক শপথটির জন্ম ১৯৪৮-এ, World Medical Association- এর Declaration of Geneva-র সঙ্গে। কুসংস্কার এবং আদিমতাকে বাদ দিয়ে, স্রেফ নামটুকু রেখে নতুন শপথ নির্মিত হয়েছিল সেদিন – হয়তো ত্রুটিমুক্ত নয়, তবুও, আজও প্রযোজ্য। আর চরক শপথ? হ্যাঁ, এটিও নবনির্মিতই বটে। আদি চরক সংহিতায় কোনো শপথ সে অর্থে বর্ণিত নেই। হয়তো এটা মেনে নিতে, জাতীয়তাবাদী জিগির সত্ত্বেও, অসুবিধা হতো না। অন্তত যদি শপথটা মেনে নেবার মতো হতো। শপথ পাঠ করানোই হচ্ছে 'দ্বিজ'-কে, 'পবিত্র অগ্নি'-কে সামনে রেখে। শপথে চিকিৎসার এথিক্সের চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে ছাত্রের ব্যক্তিজীবন, যুক্তির বদলে গুরুর প্রতি আনুগত্য। এবং মহিলা রোগীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে নিদান দেওয়া হচ্ছে স্বামী বা অন্য নিকটাত্মীয়ের উপস্থিতি ছাড়া চিকিৎসা চলবে না, বিশেষ করে পুরুষ ডাক্তারদের ক্ষেত্রে (তালিবানি শরিয়ার সঙ্গে কী মিল না?)। এই শপথ হয়তো সত্যিই সংঘের ব্রাহ্মণ্যবাদী, পুরুষতান্ত্রিক, জাতীয়তাবাদী, যুক্তিবিমুখ স্বপ্নের সোপান। কিন্তু না, আমাদের মতো বিজ্ঞানকর্মীদের পক্ষে হজম করা মুশকিল। অবশ্য ফ্যাসিবাদ কবেই বা আমাদের তোয়াক্কা করেছে!

তবে স্রেফ ফ্যাসিবাদের ঘাড়ে দায় চাপিয়ে দিয়েই পরিস্থিতি পুরোটা বোঝা যায় না। আগেই বলেছি, অন্ততপক্ষে আমার বিশ্বাস, কারণ একটি নয়, দুটি। এবং বাস্তব জীবনে দ্বিতীয় কারণটি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কথায়ই আছে, 'বাপ বড়া না ভাইয়া, মা বড়া না ভাইয়া, সাবসে বড়া রূপাইয়া' – এবং আজকের এই পরিস্থিতিতে, কথাটা একশো শতাংশ সত্যি। আয়ুর্বেদ বা যেকোনো অল্টারনেটিভ মেডিসিনের ভারতে জনপ্রিয়তার কারণ খুঁজলে সামাজিক অনগ্রসরতা, আধুনিকতার প্রতি অবিশ্বাসকে ছাপিয়ে কিন্তু উঠে আসে অন্য একটি কারণ – অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আধুনিক চিকিৎসা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। এই পরিস্থিতির পিছনেও কারণ কম নেই, সে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সরকারি চিরাচরিত অবহেলাই হোক বা বেসরকারি চিকিৎসাব্যবস্থার দিনে ডাকাতি। এ সমস্যা নতুনও নয়, ২০১৪-র আগেও ভালোমতোই ছিল, বারংবার সমস্যা চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো সত্ত্বেও ছিল। আর ২০১৪ পরবর্তী বেসরকারিকরণের যুগে, চিররুগ্ন সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থা যখন চিতায় ওঠার মুখে, তখন যে এসব 'বিকল্প চিকিৎসা' বাড়বে, তাতে আর আশ্চর্যের কী! তাই স্বাস্থ্যখাতে সরকারী বাজেট যেমন কমছে, তেমনি পাল্লা দিয়ে বাড়ছে আয়ুর্বেদ, হোমিওপ্যাথিসহ এরকমই বিভিন্ন অবৈজ্ঞানিক বা অপবৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দেবার চেষ্টা। কেন? এইসব পদ্ধতিতে প্রশিক্ষিত 'চিকিৎসকেরা' এখন সস্তা শ্রমিক। এদেরকে

'কমিউনিটি হেলথ প্রাক্টিশনার' মার্কা বিভিন্ন বিশেষণে ভূষিত করে, বা ব্রিজ কোর্স করিয়ে চিকিৎসক বানিয়ে ফেলতে পারলে সরকারের খরচা সাশ্রয়। ফুটো কপাল, অবশ্যই, সরকারি চিকিৎসাব্যবস্থার ভরসায় থাকা সাধারণ মানুষের!

বিকল্প চিকিৎসা ব্যবস্থার বিপদ কম নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পদ্ধতিগুলো অপরীক্ষিত, আরো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত এবং সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক বলে পরিণত। অনেক সময়ই এই চিকিৎসা সরাসরি ক্ষতি করতে পারে রোগীদের (বমি আটকাতে হোমিওপ্যাথিতে বেলাডোনা দেওয়ার কথা মনে আসে প্রথমেই), কিন্তু তার থেকেও বহুগুণ বেশি ক্ষতি করে অসুস্থ মানুষকে প্রাথমিক চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করে। রোগটি হয়তো তুলনামূলকভাবে অতও বিপজ্জনক নয়, হয়তো আরোগ্য সহজই, কিন্তু গ্রামের হাতুড়েদের (এই থুড়ি, হাতুড়ে না, সরকারি স্বীকৃতি মতে এরা ডাক্তার, এদের হাতুড়ে বলা শাস্তিযোগ্য অপরাধ) হাত ছাড়িয়ে যতক্ষণে রোগী এলো চিকিৎসকের হাতে, ততক্ষণে সব শেষ। কিন্তু এই বিকল্পের বিকল্প কী তবে? রেগে গিয়ে দু-একটা বক্তৃতা দেওয়া? বছরে গড়ে চারটে ডেপুটেশন এবং দুটি প্রবন্ধ লেখা? এবং তারপর বেসরকারি নার্সিংহোমের এসি চেম্বারে বসে বিলাপ করা? না বোধ হয়। যেকোনো পরিস্থিতি বদলাতে কারণ বদলাতে লাগে। ফ্যাসিবাদকে না আটকালে, চিকিৎসাক্ষেত্রে সরকারি অবহেলা না পাল্টালে আজকের পরিস্থিতিও পাল্টাবে না। আর স্রেফ কয়েকটা 'কাগুজে' প্রতিবাদ সেই পাল্টানোর কাজটাও করবে না। ■

কুসংস্কার টিকিয়ে রাখে কারা ঃ

ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি UGC-র 'বৈজ্ঞানিক' উপদেশ

– রঞ্জিত চক্রবর্তী

বছরের শুরুতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ভারতের এক হাজারের বেশি বিশ্ববিদ্যালয় ও চল্লিশ হাজারের বেশি কলেজের উপাচার্য ও অধ্যক্ষদের উদ্দেশ্যে এক চিঠি লিখে উপদেশ দেন যে ভারতের স্বাধীনতার ৭৫ বর্ষ উদ্‌যাপনের অঙ্গ হিসেবে ছাত্র-ছাত্রীদের **'৭৫ কোটি সূর্য নমস্কার প্রকল্পে'** অংশগ্রহণ করতে উৎসাহ দেওয়া হোক। ১লা জানুয়ারি থেকে ৭ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই কাজ করে ওয়েব সাইট, নোটিশ বোর্ড, প্যামফ্লেট-এর মাধ্যমে প্রচার করা হোক।

এই চিঠির সংযোজনী বৈজ্ঞানিক বিচারে খুবই সমৃদ্ধ। সূর্য নমস্কারের ১২টা মুদ্রা প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী দিনে ১৩ বার করে (১লা জানুয়ারি থেকে ২০শে ফেব্রুয়ারির মধ্যে) ২১ দিন ধরে করবে। শুধু করলেই হবে না ২১ দিনের প্রত্যেক দিন ১ মিনিটের ভিডিয়ো করে পাঠাতে হবে। কিন্তু কোথায় পাঠাতে হবে তা নির্দিষ্ট করা নেই।

বিজ্ঞান সচেতন সমাজ এমন উদ্যোগকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে পারে বা গাম্ভীর্যপূর্ণ বিরোধিতা করতে পারে। কিন্তু তার দ্বারা এমন বিধিসম্মত প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের দূর পরিকল্পনাকে খাটো করা যায় না। এর আগে UGC যে সব দিবস পালনের জন্য উপদেশ দিয়েছে তার মধ্যে আছে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক দিবস, সেনাবাহিনী দিবস, যোগ দিবস, মরণোত্তর বীরত্ব পুরস্কার প্রাপকদের স্মরণে ক্যাম্পাসে শহীদ দেওয়াল তৈরী ইত্যাদি।

এই ধরনের কার্যক্রম করার পর বিভিন্ন মহল থেকে যখন বিরোধিতা আসে তখন একশো গুণ হিংস্রতা দিয়ে তাকে দুরমুশ করে দেওয়া হয়। যেমন এক্ষেত্রে যারা বিরোধিতা করেছেন – এই যুক্তিতে যে এসব করা UGC-র কাজ নয় বা কিছু ছাত্রের পক্ষে সংবেদনশীল বিষয়ে রাষ্ট্র ও শিক্ষা সংস্থানের ভূমিকা রাখা উচিৎ নয় – তখন NCERT-র পূর্ব নির্দেশক জে. এস. রাজপুতের মত লোকেরা ময়দানে নেমে পাল্টা যুক্তি প্রচার করছে। 'আমাদের সকলেরই জানা আছে কারা ধর্মনিরপেক্ষতার নামে প্রত্যাশিত পথে বিরোধিতা করছে। তারা সম্পূর্ণ মূর্খ তাই যোগাভ্যাসকে হিন্দুত্বের সাথে মেলায়। রাষ্ট্রপুঞ্জ ১৭৫ দেশের সমর্থনে বিশ্ব যোগ দিবসকে গ্রহণ করেছে।' এর সাথে যুক্ত হবে সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার। এক বড় জনসমষ্টির কাছে এর যথার্থতা প্রমাণিত করা হবে। যারাই এর বিরোধিতা করবে তাদের দেশবিরোধী-রাষ্ট্রবিরোধী রূপে চিহ্নিত করা হবে। অন্যদিকে সংকীর্ণ-বিদ্বেষ মূলক-অন্ধবিশ্বাস নির্ভর কতগুলো ধ্যান-ধারণা-রীতি-রেওয়াজকে বিনা প্রশ্নে মেনে নিতে, তার হয়ে গলা ফাটানোর জন্য এক বিরাট সংখ্যক জনসমুদায়কে প্রস্তুত করা হবে।

সুতরাং বিজ্ঞান সচেতন প্রগতিবাদী মানুষের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ এসে উপস্থিত হয়েছে। ■

সংগঠন সংবাদ

হাওড়া জেলায় কৃষিমেলা

গত তিন বছরের মতো এবছরও ৩০শে জানুয়ারি ২০২২ হাওড়া জেলায় কানপুর মা মনসা স্বেচ্ছাসেবক সমিতির সংলগ্ন মাঠে বিজ্ঞান মনস্ক, পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া আমতা ইউনিটের উদ্যোগে কৃষিমেলা অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের নেতৃস্থানীয় সদস্য, আমতা ইউনিটের প্রাণপুরুষ, এলাকার প্রভূত জনপ্রিয় সহদেব মাজিকে স্মরণ করে মেলার সূচনা হয়। মঞ্চের নাম রাখা হয় সহদেব মাজি স্মৃতি মঞ্চ। প্রবীণ কৃষকরা মেলার উদ্বোধনের পর ছাত্র-ছাত্রীদের কৃষি বিষয়ক ছবি আঁকা দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। একজন ছাত্র 'লক ডাউনে কেমন ছিলাম' শীর্ষক স্বরচিত রচনা পাঠ করেন। দুপুর থেকে কৃষকরা তাঁদের শ্রমের ফসলের সম্ভার নিয়ে হাজির হন।

দুপুর থেকে স্থানীয় ক্লাবের সম্পাদক, পুরাষ-কানপুর নটবর পাল হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক (টিচার ইন চার্জ) এবং প্রবীণ এবং নবীন কৃষকজনতা সহ মোট ১০ জন বক্তব্য রাখেন। বিজ্ঞান মনস্ক, কৃষক-তথা মেহনতী মানুষকে মানুষ হিসেবে সম্মান দিয়েছে বলে অনেকে মন্তব্য করেন। একের পর একজন কৃষক তাঁদের জীবনের মূল্যবান অভিজ্ঞতা এবং সমস্যার কথা তুলে ধরেন। কৃষিজ সরঞ্জামের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে, অকাল বর্ষণে ফসল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, ভাগচাষীরা কৃষকের মর্যাদা এবং সরকারি সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, রোদে-জলে-শীতে হাড়ভাঙা খাটুনির পরও কৃষকরা ফসলের লাভজনক দাম পাচ্ছেন না এগুলোই ছিল বক্তার বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার। কৃষকদের কান্না প্রশাসন বা নেতামন্ত্রীদের কানে পৌঁছচ্ছে না। একজন বক্তা এই প্রসঙ্গে সম্প্রতি উত্তর ভারতের কৃষক আন্দোলনের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন এবং সেই আন্দোলন থেকে শিক্ষা নিয়ে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এগিয়ে চলার বার্তা দেন।

আমতা ইউনিটের সম্পাদক তাঁর বক্তব্যে বলেন "আমরা এই নিয়ে চতুর্থবার কৃষিমেলার আয়োজন করতে পারছি এলাকার জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতায়। আমরা এনজিও নই, সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা নিই না, এলাকার জনগণের সহযোগিতার মাধ্যমেই বার্ষিক অনুষ্ঠান এবং সারা বছরের কর্মসূচী প্রতিপালন করি। কোভিড পরিস্থিতিতে আমরা সাধ্যমত জনতাকে সচেতন করা, পাশে দাঁড়ানো, চিকিৎসায় সহযোগিতার প্রয়াস নিয়েছি। কৃষি গবেষণা দপ্তরের সহযোগিতায় কৃষকদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করেছি। কৃষক আন্দোলনের বার্তা লাগাতার জনতার মধ্যে পৌঁছে দিয়েছি এবং জনমত গঠনের প্রয়াস নিয়েছি, জনতাকে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারমুক্ত করার প্রয়াস নিয়েছি। আমরা চাই শুধু বছরে একবার মেলা নয়, প্রতিটি সামাজিক সমস্যার সমাধান সংগঠিতভাবে করার জন্য আসুন ঐক্যবদ্ধ হই।"

এলাকার বহু সাংস্কৃতিক টীম সঙ্গীতের সাথে নৃত্য, গান, আবৃত্তি পরিবেশন করেন। এই অনুষ্ঠানগুলির সাংস্কৃতিক মান যথেষ্ট উন্নত। মেলাকে কেন্দ্র করে সুস্থ, প্রগতিশীল সংস্কৃতি চর্চার বিকাশ হচ্ছে এটা সকলেই স্বীকার করবেন। সময়াভাবে বিজ্ঞানের খেলা – 'অলৌকিক না লৌকিক' প্রদর্শন করা যায় নি। বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয় প্রশ্নোত্তরের আসর এবং সবশেষে সাম্প্রতিক কৃষক আন্দোলনের উপর বিজ্ঞান মনস্ক, পশ্চিমবঙ্গ পরিবেশিত তথ্যচিত্র 'ঝড় আসছে' প্রদর্শিত হয়। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে এবং সমাজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এই তথ্যচিত্রটি প্রস্তুত করা হয়েছে।■

কুচবিহার জেলার ডাঙ্গারহাটে কৃষি প্রদর্শনী এবং সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান

গত ৭ই ফেব্রুয়ারি, ২০২২, উত্তরবঙ্গের বাংলাদেশ সীমান্ত বর্তী কুচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ ব্লকের ডাঙ্গারহাটে বিজ্ঞান মনস্ক'র স্থানীয় শাখার উদ্যোগে স্থানীয় ক্লাব বটতলা সম্রাট সংঘ'র সাথে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাঙ্গনে যৌথ উদ্যোগে একটি বিজ্ঞান ও সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় ছাত্র-ছাত্রীদের ছবি আঁকা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে। এরপর বাচ্চাদের হাড়িভাঙা খেলা হয়। এরপর বিজ্ঞানের প্রথম শহীদ জিওদার্নো ব্রুণো, বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী গ্যালিলিও এবং বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা'র ছবিতে সদস্যরা পুষ্পদান করে শ্রদ্ধা জানান। জিওদার্নো বুনোর মৃত্যুদিন ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারি, গ্যালিলিও জন্ম ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দ এবং মেঘনাদ সাহা'র মৃত্যু হয় ১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে। এই ফেব্রুয়ারি মাসেই এই তিন মনিষীর জন্ম/মৃত্যু দিন হওয়ায় তা পালন করা হয় তাঁদের অবদানকে স্মরণ করে। এরপর ভিডিও সহযোগে প্রশ্নোত্তরের আসর হয়। অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রী এবং গ্রামবাসীরা ভালো সাড়া দেন। দুপুর থেকে স্থানীয় কৃষকরা তাঁদের পরিশ্রমের ফসল নিয়ে আসেন। একদিকে প্রতিযোগিতামূলক কৃষি প্রদর্শনী এবং অন্যদিকে অনুষ্ঠান চলতে

থাকে। 'অলৌকিক নয় লৌকিক' নামে বিজ্ঞানের খেলা মানুষের জানার আগ্রহ সৃষ্টি করে। অবশেষে সাম্প্রতিক উত্তরভারতে যে কৃষক আন্দোলন প্রায় একবৎসর ব্যাপী চলেছে তার উপর তথ্যচিত্র 'ঝড় আসছে' প্রদর্শিত হয়। প্রবল শীতের মধ্যেও শত শত গ্রামীণ জনতা ব্যাপক উৎসাহ নিয়ে অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেন।■

পাথর প্রতিমায় বিজ্ঞান মনস্ক'র অনুষ্ঠান

সুন্দরবনের পাথর প্রতিমা ব্লকের দুর্গাগোবিন্দপুর গ্রামে স্থানীয় জনকল্যাণ সমিতির বার্ষিক অনুষ্ঠানে গত ২১-২৩শে ফেব্রুয়ারি বিজ্ঞান মনস্ক অংশগ্রহণ করে। বিজ্ঞানের প্যাভেলিয়নে 'সাপ নিয়ে আতঙ্ক ও মুক্তি' প্রশ্নে, বিজ্ঞানের আবিষ্কার এবং অন্যান্য পোস্টার প্রদর্শনী এবং সুন্দর সুন্দর বিজ্ঞানের মডেল প্রদর্শন করে বিজ্ঞান মনস্ক'র স্থানীয় শাখার যুবক-যুবতীরা। ২১শে ফেব্রুয়ারি নেতাজী মঞ্চে, ২২শে ফেব্রুয়ারি সুকান্ত মঞ্চে এবং ২৩শে ফেব্রুয়ারি ভগৎ সিং মঞ্চে এই ভিডিও সহযোগে বিজ্ঞান ও ইতিহাস নিয়ে প্রশ্নোত্তরের আসর এবং কৃষক আন্দোলনের উপর তথ্যচিত্র 'ঝড় আসছে' প্রদর্শন করা হয়।■

পাথর প্রতিমার ব্রজবল্লভপুরে বিজ্ঞান চর্চা

গত ৯ই মার্চ ২০২২, পাথর প্রতিমা ব্লকের ব্রজবল্লভপুর ক্ষেত্রে বিজ্ঞান মনস্ক'র স্থানীয় শাখার উদ্যোগে দেখানো হয় নানা বিজ্ঞানের খেলা এবং সাপ নিয়ে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে প্রায় ৩০ জন ছাত্র উৎসাহ নিয়ে অনুষ্ঠান দেখেন। সংগঠন এই অঞ্চলে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে বিজ্ঞান চর্চার উদ্যোগ নিয়েছে।■

ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ

সংগঠন গত ৪ঠা মার্চ এই যুদ্ধ প্রশ্নে ফেসবুকে বিবৃতি প্রকাশ করেছে এবং ৭ দফা দাবির ভিত্তিতে উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি এবং পুরুলিয়া শহরে পোস্টার প্রদর্শন করা হয়।■

পুরুলিয়াতে আলোচনাসভা

পুরুলিয়া ইউনিটের উদ্যোগে গত ১৩ই ফেব্রুয়ারি ২০২২, আয়োজিত আলোচনা সভার বিষয় বস্তু ছিল যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশের সাথে মানব সমাজে বিজ্ঞান মনস্কতার বিকাশ কী সমতালে চলছে? যদি না হয়, তো তার কারণ কী?

শুরুতেই সঞ্চালক বলেন যে প্রকৃতির নিয়ম খুঁজতে গিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছে। আজকের দিনে বিজ্ঞানের প্রয়োগ হচ্ছে বৈষয়িক জীবনে। ফলে অজান্তেই মানুষ বিজ্ঞানকে কাজে লাগান। এর পাশে মহাকর্ষ তরঙ্গের মতো তত্ত্বগত বিজ্ঞানের অনেক অগ্রগতি হলেও সমগ্র সমাজ সেই বিজ্ঞান সম্পর্কে অবগত নয়, সেটা রয়েছে মুষ্টিমেয়র মধ্যেই। এছাড়া বিজ্ঞানের অতিদ্রুত অগ্রগতি হলেও মানুষের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ হচ্ছে না। এটা আমাদের সামাজিক জীবনের এক বিরাট বৈপরীত্ব। এই বিষয়ে আলোকপাত করার জন্য আহ্বান রাখেন তিনি।

প্রথম বক্তা বলেন যে আমরা যে সামাজিক আধারটা থাকলে মানুষে বিজ্ঞানমনস্কতা ও বিজ্ঞানচর্চার মধ্যে থাকা ফারাকটা মেটানো যায় সেটা তৈরি করতে পারিনি। তিনি একথাও বলেন – 'বিজ্ঞানের এই অস্বাভাবিক উন্নতিই কি বাধা? এতটা উন্নতি হাতের কাছে পেয়ে আমরা কি ভাবতে ভুলে গেছি?' তিনি বলেন যেখানে সামাজিক বৈষম্য, সেখানে কুসংস্কার জন্ম নেয়। আমরা আত্মশক্তিকে হারিয়ে ফেলছি।

দ্বিতীয় বক্তা বলেন যে তিনি শিক্ষক হয়ে এই অনুভব করেন যে শিক্ষা মানুষকে সম্পূর্ণতা দেয়। কিন্তু কিছু বিজ্ঞান চর্চাকারী (যেমন ডাক্তারদের একাংশ) বিজ্ঞান বিরোধী কাজ করেন। এছাড়া আরো একটা কারণ হল বিজ্ঞানের অগ্রগতি ব্যাপক হলেও যারা এই সমস্ত সুযোগ সুবিধা মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার অধিকারী, তারা হয়তো লাভ-লোকসানের হিসেব কষছেন। এমন অবস্থা সব দেশে একরকম নয়। আমাদের গোড়ায় গলদ।

তৃতীয় বক্তা বলেন মনের শান্তির জন্য (Peace of mind) অলৌকিতার চর্চায় আপত্তি নেই। তিনি গণিতবিদ রামানুজমের উদাহরণ দেন। পূর্জো-পার্বণে ইকনমিক কনট্রিবিউশনও করে সমাজে।

চতুর্থ বক্তা, তৃতীয় বক্তার শেষ কথার বিরোধিতা করে বলেন দুর্গা পূজোতো সর্বত্র হয় না, যে সব দেশ উন্নত বিশ্বের দেশ, সেখানে কী হয়? তিনি বলেন অলৌকিকতার আগমন গোষ্ঠী ভিত্তিক আদিম সমাজ থেকে। এসব রাজনীতি বর্জিত বিষয় নয়। আর মনের শান্তির সঙ্গে পূজোর কোন সম্পর্ক নেই বলে তিনি মনে করেন।

পঞ্চম বক্তা বলেন যে আমাদের এই আলোচনাটাকে ব্যক্তিগত স্তরে না রেখে সমষ্টিগত স্তরে নিয়ে যেতে হবে। আমাদের নিরক্ষর মানুষের কাছেও পৌঁছতে হবে।

এরপর একজন কিশোরী দর্শক (নাম সেজুতি সিনহা) কবি প্রনব ঘোষের লেখা একটি কুসংস্কার বিরোধী কবিতা পাঠ করে।

ষষ্ঠ বক্তা বলেন যে ধর্ম শরীর ও মনকে সুস্থ রাখার জন্য।

বিপত্তারিনী সুতো, আংটির পাথর মনের সংযোগের প্রয়োজনে, এখানে বিজ্ঞান আছে। ইস্কুলে বাচ্চাদের প্রার্থনা, পূর্ণিমা-অমাবষ্যায় উপবাস এসবের পিছনেও আছে বিজ্ঞান।

সপ্তম বক্তা বলেন যে আগের বক্তা সবকিছুর মধ্যে বিজ্ঞান খুঁজছেন। তিনি বলেন যে মানুষের জীবনে বিজ্ঞান এসেছে জীবিকা নির্বাহ থেকেই। আর রাষ্ট্র ধর্মীয় বিশ্বাসকে টিকিয়ে রাখতে বৈজ্ঞানিকদের উপর নির্যাতন ও হত্যা করেছে। এছাড়া রাষ্ট্র ধর্ম বহির্ভূত অন্য ধর্মাবলম্বীরাও আক্রান্ত হয়েছেন। এটা ইতিহাস। এখানে রাষ্ট্রের দায়-দায়িত্বটাই প্রধান বিষয়। প্রকৃতিতে আমাদের যে আগমন, প্রকৃতির সমস্ত কিছুর উপর সমান অধিকার নিয়ে আমরা জন্মেছি। এই অধিকার আছে মৃত্যু পর্যন্ত প্রত্যেক মানুষের সমান। কিন্তু গোষ্ঠী ভিত্তিক সমাজ, রাষ্ট্র এগুলো এনেছে বিশেষ জোড় খাটানোর জায়গা থেকে। রাজনীতির ক্ষেত্রেও সূত্র একটাই। সেই সূত্রটা বার করা আমাদের কাজ। বিজ্ঞান আন্দোলন স্তরে একে নিয়ে যেতে বিষয়গুলো স্পষ্ট হওয়া দরকার।

অষ্টম বক্তা বলেন যে বিজ্ঞান মনস্কতাকে পরিবার পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে। নবম বক্তার বক্তব্যে বিজ্ঞানের উন্নতির যুগে বহু কুসংস্কারে বিশ্বাসী দেখা যায় – এটা বৈপরিত্বের উদাহরণ।

দশম বক্তা বলেন যে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সমাজ বিকাশ সমান হারে এগোচ্ছে না। এখানে রাষ্ট্রের ভূমিকা প্রধান। এরপর তিনি আদিম সাম্যবাদী যুগ থেকে আজ পর্যন্ত অবস্থার বিশ্লেষণ করে দেখান আজকের যুগে সবকিছু ডিক্টেট করে রাষ্ট্র।

একাদশ বক্তা প্রশ্ন তোলেন যে সর্বস্তরে বিজ্ঞান পৌঁছচ্ছে না কেন?

দ্বাদশ বক্তা বলেন যে আলোচনা সভায় উপস্থিত সকলের নিজেদেরকে পরিবর্তন করা দরকার। আমরা যদি একটু একটু করে পরিবর্তিত হই, তবেই সমাজের পরিবর্তন হবে।

ত্রয়োদশ বক্তা বিজ্ঞানের সংজ্ঞা থেকে আলোচনা শুরু করে বলেন যে আজকের উৎপাদনটা সমাজীকৃত হয়ে গেছে, অথচ বন্টনটা ব্যক্তিগত থেকে গেছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতি না হওয়ার কারণ বন্টন সকলের জন্য হচ্ছে না।

চতুর্দশ বক্তা বলেন যে আগের বক্তার সঙ্গে অনেকাংশে একমত। এছাড়া আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাও এর জন্য দায়ী।

পঞ্চদশ বক্তা বলেন যে সরকার বিজ্ঞান মনস্কতার প্রচারের বদলে মানুষকে মিস্‌গাইড করেছে ও করে। করোনাকালে থালা বাজাতে বলেছে। অনেকে অপপ্রচার করে বলেছে এত ডাক্তার, ভ্যাকসিনের কি দরকার? এরাও মানুষকে মিস্‌গাইড করেছে। তিনি বলেন যে বিজ্ঞানের যত উন্নতি হয়েছে, তত বেশি মানুষ অসামাজিক হয়েছে। এখানে বিজ্ঞান দায়ী নয়, এর জন্য দায়ী এর অপপ্রয়োগকারীরা। অতিদ্রুত উন্নতি মানুষকে অসামাজিক করেছে।

শেষে সঞ্চালক বলেন যে সকলের বক্তব্যের যেটা মিল, তা হল এই দুটি আলোচ্য বিষয় সমতালে এগোচ্ছে না। এখন এর সমাধানের জন্য আমাদের সচেতন হয়ে একজোট হতে হবে। এখান থেকে কাজটা শুরু না করলে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

এই আলোচনা সভার শেষে অনলাইন শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন পাঠকদের প্রবন্ধ লেখার জন্য ইউনিটের পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করা হয়।■

চিঠিপত্র ঃ

মাননীয় সম্পাদক,

'বিজ্ঞান মনস্ক' আয়োজিত কৃষিমেলা ২০২২ অনুষ্ঠিত হলো গত ৩০শে জানুয়ারি ২০২২। এতে একজন কৃষক হিসাবে অংশগ্রহণ করে আমরা গর্বিত। আয়োজক সংস্থার সারাদিনের কর্মসূচী যেমন 'বসে আঁকো' প্রতিযোগিতা, লকডাউনের অভিজ্ঞতায় শিশুমন, জনসমক্ষে ফসলের সম্ভার, কৃষকদের সম্মান জ্ঞাপন, তথ্যচিত্র, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আরও অনেক কিছু। এটি এককথায় এলাকার মানুষের প্রাণের অনুষ্ঠান। সংস্কৃতির মেলবন্ধন। হয়ত আর পাঁচটা মেলার মত প্রচুর ভিড় এই মেলায় থাকে না তবে এই মেলার অন্যতম অলঙ্কার হলো কৃষকদের প্রকাশ্যে মতপ্রকাশ, কৃষকদের অভিজ্ঞতার আদান-প্রদান। তাঁদেরও যে আমাদের সমাজে একটা বড় ভূমিকা আছে আর সেই ভূমিকাকে কিভাবে প্রতিবাদের হাতিয়ার করা যায় তার একটা উদ্যোগ কিন্তু এই মেলার সার্থকরূপ। যে সকল উদ্যোগী বন্ধুরা এই মেলার স্বপ্ন দেখেছেন, তাকে বাস্তবে রূপ দিয়ে মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন, তাঁদের সেই পরিশ্রমকে এবং তাঁদের প্রতিষ্ঠান, 'বিজ্ঞান মনস্ক'কে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। মেলার দীর্ঘায়ু কামনা করি আর বলি –

"হালকা শীতে নদীর পাড়ে
ফসল ভরা ভেলা।
চাষী ভায়ের প্রাণের কথা
আজকে কৃষিমেলা ॥"

শ্রীমন্ত কর
শিবনারায়ণ চক
হাওড়া

হাওড়া, আমতায় কৃষিমেলায় জনসমাবেশ

কুচবিহারের ডাঙ্গারহাটে কৃষক আন্দোলনের ভিডিয়ো প্রদর্শনী

শিলিগুড়ির উপকণ্ঠে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রদর্শন

সুন্দরবনের পাথরপ্রতিমায় বিজ্ঞানের মডেল প্রদর্শনী

বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘুঁটে দেওয়ার প্রশিক্ষণ

সোস্যাল সায়েন্স বিভাগের ডিন অধ্যাপক কৌশল কিশোর মিশ্র ছাত্রদের ঘুঁটে তৈরির টেকনিক শিখিয়ে বি. এইচ. ইউ-এর ইন্টিগ্রেটেড রুরাল ডেভলপমেন্ট সেন্টারে ছাত্রদের দিয়ে তা তৈরিও করান। বি. এইচ. ইউ কর্তৃপক্ষ সেই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ভিডিয়ো সকলের সাথে ভাগ করে নিয়েছেন। তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন এই ঘুঁটে হোম-যজ্ঞ-পূজা এবং জ্বালানীরূপে ব্যবহার করা যাবে। চাষীদের আয় বাড়বে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্ররা গ্রামে গিয়ে লোকেদের ঘুঁটে তৈরির প্রশিক্ষন দেবেন। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করেছেন দেশী গরু পালন করে চাষীদের আর্থিক সাহায্য করা হোক। ঐ ডিন সেন্টারের কর্তাকে নির্দেশ নিয়েছেন একটা স্টার্ট আপ কোম্পানি খুলে এই জিনিষ যেন বাজারে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনাটা মনে হয় ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যতের ইঙ্গীতবাহী!■

সহযোগিতা রাশি ঃ ১৫.০০ টাকা

Registration No.: S/IL/97407 of 2012-13

চরক শপথ নেওয়ার সরকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ডাক্তারী ছাত্ররা

পুরুলিয়ায় আলোচনা সভায় কর্মী বৃন্দ

পাথরপ্রতিমায় খুদে পড়ুয়ারা

বিজ্ঞান মনস্ক, পশ্চিমবঙ্গের তৃতীয় সম্মেলন

২৪শে এপ্রিল, ২০২২, কলকাতার ভারত সভা হল

বেলা ১২টা থেকে ৪টা

সকল বিজ্ঞান মনস্ক, প্রগতিশীল, যুক্তিবাদী মানুষকে আহ্বান জানাই

বিজ্ঞান মনস্ক'র পক্ষে নন্দা মুখার্জী প্রযত্নে অপন মোতিলাল, ১৭৮/এন, বাসুদেবপুর রোড, ঐক্যতান ক্লাবের (বকুলতলা) নিকটে
কলকাতা - ৭০০০৬১, কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ৩০, বিধান সরণী, কলকাতা - ০৬ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ শিশির কর্মকার – ৯৪৩২ ৩০০৮২৫ প্রকাশক ঃ নন্দা মুখার্জী ঃ ৯৮৮৩ ২৯৯৯২৮
Email : samikshan2009@gmail.com Website : https://samikshan.com